

কিছুতেই সমান হয় না। কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। এই কারণে সাধারণতঃ লোকের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। কাহাকেও তারিফ করিয়া আসমানে উঠায় আবার কাহাকেও মন্দ বলিতে বলিতে পাতালে নামায়। ইহা বড় মছিবত।

২। বাড়ী-ঘর খালি রাখিয়া কোথায়ও যাইতে হইলে এমন লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাও, যে লোক তোমার নিকট বড় আমানতদার। সকলের উপর সমানভাবে নির্ভর করিও না। শহরে বা গ্রামে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু প্রতারক। কেহ হয়ত হাজী সাহেব বা দরবেশ সাহেব অথবা ফকীর সাজিয়া আসে—রাশিগণনা করে, তাবিয় দেয়। ঝাড়-ফুঁকের কাজ করে। এইরূপ লোককেও কোন মতেই ঘরে ঢুকিতে দেওয়া উচিত নহে। আসিলে পর বাহিরে রাখিয়াই বিদায় দেওয়া উচিত। কেননা, এইরূপ ভণ্ড ও প্রতারকের হাতে পড়িয়া বহু লোকের ঘর-বাড়ী উজাড় হইয়া যায়।

৩। হাত বাস্কে অথবা পানের বাটায় টাকা-পয়সা, গহনাপত্র যদি রাখিয়া থাক, তবে উহা খোলা রাখিয়া উঠিয়া যাইও না। হয় উহা তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাও, নতুবা সঙ্গে লইয়া যাও।

৪। যতদূর সম্ভব কখনও বাকী সওদা আনাইও না, একান্ত ঠেকাবশতঃ যদি আনাইতে হয়, তবে দর ভাও জিজ্ঞাসা করিয়া তারিখ লিখিয়া রাখ এবং পয়সা হাতে আসিতেই তৎক্ষণাৎ দাম পরিশোধ করিয়া দাও।

৫। মুদীর দোকানের সওদার হিসাব, চাউলের বা আটা-ভাঙ্গনী খরচ, ধোপার মজুরী ইত্যাদির হিসাব সর্বদা লিখিয়া রাখিও, মৌখিক হিসাবের ভরসা করিও না।

৬। যতদূর সম্ভব সংসার খরচে মিতব্যয়ী হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিও এবং তোমাকে যে পরিমাণ খরচের টাকা দেওয়া হয়, উহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিও।

৭। বাহির হইতে যে সকল মেয়েলোক তোমার ঘরে আসে, তাহাদের সম্মুখে এমন কথা প্রকাশ করিও না, যে কথা তোমার বাহিরে প্রচার হইতে দেওয়ার ইচ্ছা নাই। কেননা এই সব ভবঘুরে মেয়েলোকের অভ্যাসই হইতেছে এক বাড়ীর কথা দশ বাড়ীর লোকের নিকট প্রচার করা।

৮। আটা অথবা চাউল অনুমান করিয়া পাক করিতে দিও না; বরং নিজ সংসারের খরচ বুঝিয়া দুনো বেলার সব বস্তু মাপিয়া পরিমাণমত খরচ করিও। ইহাতে যদি তোমাকে কেহ খোঁটা দেয় বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তবে, তাহার কোন পরওয়া করিও না।

৯। যে সব ছোট মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে যাতায়াত করে তাহাদিগকে কখনো অলংকার পরাইও না। কেননা, ইহাতে জান এবং মাল উভয়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১০। যদি তোমার কোন অপরিচিত লোক তোমার ঘরের দরজায় আসিয়া তোমার স্বামীর অথবা পিতা বা ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করে; কিংবা বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার পরিচয় দিয়া ঘরে ঢুকিতে চায়, তবে তুমি কোন জানাশুনা পুরুষ দ্বারা সনাক্ত না করা পর্যন্ত ঘরে ঢুকিতে দিও না; পর্দার ভিতরে আসিতে দিও না। তাহার নিকট কোন মূল্যবান বস্তু পাঠাইও না। বেশী মহব্বত দেখাইতে যাইও না বরং বে-গানা পুরুষানুচিত যত্ন করিও। এই প্রকারের লোকের দেওয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না।

১১। তদ্রূপ যদি কোন অপরিচিত স্ত্রীলোক পাঙ্কিতে বা সওয়ালীতে আসিয়া তোমার কোন আত্মীয় বাড়ী হইতে আসিয়া তোমাকে নেওয়ার কথা বলে বা এই ধরনের পরিচয় দেয়, তবে

তাহার সহিত কখনো ঘরের বাহির হইও না। অপরিচিত লোক স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক তাহার কথায় কোন কাজ কখনও করিও না।

১২। বাড়ীর মধ্যে বা আঙ্গিনায় এমন গাছ লাগাইতে নাই যাহার ফলে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা আছে, যেমন কত বেলের গাছ।

১৩। শীতকালে শীতের সময়ে কিছু বেশী কাপড় পরিধান করিও। মেয়েরা সাধারণতঃ অতিরিক্ত কাপড় পরিতে চায় না, ফলে সর্দি লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। অতঃপর কষ্টের আর সীমা থাকে না।

১৪। ছেলেপেলেদিগকে বাপ-দাদার নাম এবং বাড়ীর ঠিকানা মুখস্থ করাইয়া দিও। খোদা না করুন যদি কোন সময় হারাইয়া যায়, তবে বাড়ীর ঠিকানা ও বাপদাদার নাম বলিতে পারিলে যে কেহ তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। আর যদি দেশের ও বাপ-দাদার নাম না শিখাও, তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোনই উত্তর দিতে পারিবে না। বাবার নাম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে কেবল “আব্বা” বলিবে। ইহাছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিবে না। কে আব্বা, কে আন্মা কিছুই বুঝা যাইবে না।

১৫। কোলের শিশুকে একা ঘরে রাখিয়া কোথাও যাইও না। কোন এক স্ত্রীলোক তার দুধের শিশুকে একাকী ঘরে রাখিয়া কোথাও কাজে গিয়াছিল। এদিকে বিড়াল শিশুটিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। ইহতে দুইটি শিক্ষা পাওয়া গেলঃ প্রথমতঃ, দুধের শিশুকে একাকী রাখিয়া কোথাও যাইতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, কুকুর-বিড়ালের বিশ্বাস করিতে নাই। কোন কোন বে-ওকুফ মেয়েলোক ছেলে-পেলের বিছানায় বিড়াল দেখিয়া তাড়ায় না বরং শুইতে দেয়। আচ্ছা যদি রাত্রে শিশুর হাত-পা বিড়ালের শরীরে পড়ে আর অমনি বিড়াল কামড় আঁচড় লাগাইয়া দেয়, তবে কি করিবে? এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

১৬। ঔষধ-পত্র সর্বদা ডাক্তার বা উপযুক্ত হেকীম দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া ব্যবহার করিও। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আনাড়ী ঔষধ বিক্রেতার একটায় আর একটা উল্টা-পাল্টা ঔষধ দিয়া বসে। আবার কখনও ঔষধের সাথে এমন তিজক্রিয় পদার্থও মিশ্রিত থাকে যাহার ক্রিয়া ক্ষতিকর হইয়া পড়ে। সে সমস্ত ব্যবহার্য ঔষধ শিশিতে, কৌটায় বা পুরিন্দায় কিছু অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকিয়া যায় উহার উপর লেবেল আঁটিয়া নাম লিখিয়া রাখ, কেননা অনেক সময় না জানার কারণে অতি মূল্যবান ঔষধও ফেলিয়া দেওয়া হয়। আবার কোন সময়ে না জানার দরুন বিপরীত ঔষধ খাইয়া বিপদ ডাকিয়া আনা হয় এবং অযথা ঔষধের অপচয় হইয়া থাকে।

১৭। যাহারা অতি ঘনিষ্ঠ, শ্রদ্ধার পাত্র, অতি সম্ভ্রান্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে ধার-কর্জও লইও না এবং তাহাদিগকে বেশী কর্জও দিও না, হাঁ ঠেকা হইলে এই পরিমাণ দাও যে, যদি পরিশোধ করিতে না পারে তাহা হইলে যেন তোমার উপর কোন কঠিন চাপ না পড়ে।

১৮। যে কোন নূতন কাজ বা বড় কাজ করিতে ইচ্ছা কর, সর্বপ্রথম তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, দীনদার, পরহেয়গার, জ্ঞানী মুরব্বীর নিকট হইতে পরামর্শ নিয়া নাও।

১৯। নিজ টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পদের বিষয় সকলের নিকট আলাপ করিও না; বরং লুকাইয়া ছাপাইয়া রাখার ব্যবস্থা কর।

২০। যাহার নিকট পত্র লিখিবে প্রত্যেক পত্রের উপরেই তোমার ঠিকানা লিখিও। এই ভরসায় ঠিকানা লিখা বন্ধ করিও না যে, প্রথম পত্রে ত ঠিকানা দেওয়া আছেই, তবে আর দরকার কি ?

এরূপ করিও না, কেননা, তোমার প্রথম বারের ঠিকানা লিখা পত্র কোথায় পড়িয়া আছে তাহার খোঁজ হয়ত নাও থাকিতে পারে। সে পত্র যে প্রাপকের নিকট থাকিবেই এমন কথা হইতে পারে না। হইতে পারে পত্রের প্রাপক নিরক্ষর বা তোমার ঠিকানা তার মুখস্থ নাই। অতএব, পত্রের উপর যাহার দ্বারা লিখাইবে তাহার নিকট উহার ঠিকানা বলিতে পারিবে না তাই পত্রের উত্তর পাওয়ার আশা করা যায় না।

২১। যদি রেলের কোথায়ও সফর করিতে হয়, তবে তোমার টিকেট খুব যত্নে নিজের কাছে রাখিও অথবা সঙ্গী পুরুষলোকের নিকট দিয়া দাও। গাড়ীতে বে-খেয়ালে বেশী ঘুমাইও না। অন্য মেয়েলোক যাত্রীদের নিকট নিজের মনের কথা বলিও না। রাস্তায় অপরিচিত লোকের দেওয়া পান-পাতা, মিঠাই, খানা বা ঔষধ কিংবা আতর ইত্যাদি কিছুই গ্রহণ করিও না। অলংকার পরিধান করিয়া রেলের ভ্রমণ করিও না; বরং উহা খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে বা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দাও। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিবে তখন যাহা ইচ্ছা পরিধান কর।

২২। সফর করার সময় নিজ হাতে কিছু খরচের পয়সা অবশ্যই রাখিবে।

২৩। পাগলকে কখনও উত্তেজিত করিও না বা পাগলের সহিত কোন আলাপ করিও না। তাহার যখন হাঁস-জ্ঞান নাই, এমতাবস্থায় সে কি কথায় কি বলিয়া ফেলে বা কি কাণ্ড করিয়া বসে তাহা বলা যায় না। শেষে তুমি লজ্জিত ও দুঃখিত হইবে।

২৪। অন্ধকারে খালি পায়ে চলিও না এবং অন্ধকারে কোথায়ও হাত ঢুকাইও না। হাঁ, প্রয়োজনবোধে বাতি জ্বলাইয়া দেখিয়া শুনিয়া তারপর হাত দিতে পার।

২৫। নিজ গুপ্ত রহস্য সকলের নিকট বলিও না। অনেকে আনাড়ী বা খেলো লোকদের নিকট নিজ রহস্য বলিয়া ফেলিয়া শেষে অনুরোধ করে যে, “দেখুন, এই কথা কাহারো নিকট বলিবেন না”, কিন্তু মনে রাখিও, এই লোকই তোমার নিষেধ করার পরও বেশী করিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইবে।

২৬। প্রত্যেক কাজেরই শেষফল ভাবিয়া চিন্তিয়া তারপর কাজ করিও।

২৭। কাঁচের গ্লাস, বর্তন, বাসন ও অন্যান্য কাঁচের দ্রব্য নিষ্প্রয়োজনে বেশী খরিদ করিও না। ইহাতে অযথা অর্থের অপচয় হইয়া থাকে।

২৮। রেলের সফরের সময় যদি মেয়েলোকদের সঙ্গী পুরুষ অন্য কামরায় থাকে, তবে মেয়েলোক যাত্রীগণের গন্তব্য স্থানের স্টেশনের নাম শুনিয়াই বা স্টেশনের নাম তকতায় খোদাই দেখিয়াই নামিয়া পড়া উচিত নহে। কারণ কোন শহরে একনামে একাধিক স্টেশনও থাকে। অতএব, তুমি হয়ত হঠাৎ নামিয়া পড়িলে, অথচ প্রকৃত গন্তব্য স্থল এটা নহে, ওদিকে তুমি এখানে নামিয়া রহিলে, আর তোমার সঙ্গী পুরুষগণ যথাস্থানে নামিয়া তোমাকে খোঁজ করিয়া পাইল না। এইজন্য তোমার উচিত স্টেশনে পৌঁছিলে পর সঙ্গী পুরুষরা যখন আসিয়া নামিবার আদেশ দিবে, তখনই গাড়ী হইতে অবতরণ করা। এমনও হইতে পারে যে, পুরুষ লোক ঘুমে বিমাইতেছে বলিয়া নামতে সময়ই পাইল না, আর তুমি নামিয়া তাহাকে পাইলে না। শেষে সকলের বিপদের আর সীমা থাকিবে না।

২৯। শিক্ষিতা মেয়েলোকদের বিদেশ ভ্রমণের সময় একখানা মাসআলার কেতাব, কিছু কাগজ, একটা কলম অথবা পেন্সিল, কিছু পোস্টকার্ড, ইনভেলফ এবং ওয়ূ করিবার বদনা অবশ্যই সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৩০। বিদেশ সফরের যাত্রীদের নিকট কোন বস্তুর ফরমায়েশ দিও না যে, অমুক বস্তুটি অমুক স্থান হইতে আমার জন্য আনিবেন বা পাঠাইয়া দিবেন। তদ্রূপ বিদেশের যাত্রীদের মারফত কোন বস্তু কাহারো নিকট পাঠাইবে না, বা হাতে হাতে পত্রও পাঠাইবে না।

ইহাতে এই সামান্য কাজও কোন সময়ও অতি কঠিন হইয়া পড়ে এবং যার কাছে পাঠাইয়াছ তাহাকে উহা পৌঁছাইতে তক্লিফ হওয়ার কারণে বাহকের মনে কষ্ট পায়। কখনও চিঠি-পত্র লোক মারফত পাঠাইয়া প্রেরক নিশ্চিত থাকে, কিন্তু ভুলবশতঃ অনেক সময়ে উহা আর পৌঁছান হয় না, ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব, পাঁচ পয়সার একটা পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিয়া দিলে যেখানে নিশ্চিত মনে থাকা যায়, সেখানে অযথা এত ঝামেলার কি প্রয়োজন আছে? কোন বস্তু বিদেশ হইতে আনাইতে হইলে পার্শ্বলযোগেও আনান যাইতে পারে। আবার কোন বস্তু বিদেশে পাঠাইতে হইলে পার্শ্বলযোগে পাঠান যায়। সেই বস্তু যদি তোমার দেশে পাওয়া যায় এবং একটু মূল্য বেশী হয়, আর যাহার নিকট ফরমায়েশ দিয়াছ সেখানে যদি কিছু কম দামে পাওয়া যায়, তবে সামান্য পয়সা বাঁচাইতে গিয়া অন্যকে কষ্ট দেওয়া বড় অন্যায্য কথা। অনেক সময় সামান্য বস্তুর জন্য অযথা পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। আর যদি কোন বস্তু একান্ত ঠেকাবশতঃ বিদেশ হইতে আনাইতেই হয়, তবে উহার মূল্যটা অগ্রিম দিয়া দাও এবং যদি রেল যাতায়াত করিতে হয়, তবে কিছু পয়সা বেশী দিয়া দাও। হয়ত তোমার বস্তু তাহার বস্তুর সহিত মিলাইলে ভাড়া চার্জ হইতে পারে।

৩১। রেল গাড়ীতে অথবা সাধারণভাবে নৌকায় বা জাহাজে ভ্রমণের সময় কোন অপরিচিত ব্যক্তির কোন খাদ্য-দ্রব্য কস্মিনকালেও খাইও না। কারণ দুর্বৃত্তরা অনেক ক্ষেত্রে নেশার বস্তু বা বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া শেষে সমস্ত মাল-মাল্লা লইয়া উধাও হয়।

৩২। গাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠার সময় লক্ষ্য রাখিও, তুমি যেই শ্রেণীর টিকেট লইয়াছ, ঠিক সেই শ্রেণীর কোঠায়ই উঠিলে কিনা? তাড়াতাড়ির সময়ে উপরের শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিও না। গাড়ীর উপর শ্রেণীর চিহ্ন দেওয়া থাকে। আবার টিকেটের উপরও সকল শ্রেণীর বিভিন্ন চিহ্ন দেওয়া থাকে, তাহাতে বুঝা যায় যে, কোন্ দরজার টিকেট এবং কোন গাড়ীতে উঠিতে হইবে। গাড়ীর বাহিরে ও ভিতরে তৃতীয় শ্রেণীর 'III' চিহ্ন দেওয়া থাকে। ইন্টার ক্লাসে 'INT' চিহ্ন দেওয়া থাকে। সেকেন্ড ক্লাসে 'II' দেওয়া থাকে। আর ফার্স্ট ক্লাসে 'I' এই চিহ্ন দেওয়া থাকে।

৩৩। কাপড় জামা বা অন্য কোন কিছু সেলাই করার সময় সূচ আটকাইয়া গেলে উহা দাঁতের সাহায্যে কামড়াইয়া ধরিয়া ছুটাইতে চেষ্টা করিও না। কেননা ভাংগিয়া গিয়া বা পিছলাইয়া জিহ্বায় বা তালুতে বিধিতে পারে।

৩৪। নখ কাটার জন্য একটা নড়ইন বা চাকু সঙ্গে রাখিও।

৩৫। নির্ভরযোগ্যভাবে না জানিয়া কাহারো কোন তৈরী ঔষধ ব্যবহার করিও না। বিশেষ করিয়া চোখের ঔষধ না জানিয়া মোটেই ব্যবহার করা উচিত হইবে না। হাঁ, যদি যোগ্য চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে বা রেজেস্টারী করানোর মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে, তবে ব্যবহারে কোন ক্ষতির আশংকা নাই।

৩৬। যে কাজ হওয়া সম্বন্ধে তোমার পূর্ণ ভরসা নাই, সেই কাজে অপরকে ভরসা দিও না। অনর্থক কষ্ট পাইবে।

৩৭। কাহারো কাজের সুযোগ-সুবিধার উপর বাধা দিও না বা পরামর্শ দিতে যাইও না। হাঁ, সে লোকের উপর যদি তোমার অধিকার থাকে বা তার কাজে দখল দিতে পার।

৩৮। কাহাকেও বেড়াইতে বা খানা খাইতে দেবী করার জন্য অতিরিক্ত সাধাসাধী করিও না, কেননা অতিরিক্ত সাধাটা কোন সময় বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। এইরূপ মহব্বত প্রকাশে কি লাভ? যাহার শেষফল ঘৃণা ও অভিযোগের সৃষ্টি করে।

৩৯। এত ভারী বোঝা বহন করিও না, যাহাতে কোন প্রকার দৈহিক গঠনের বিকল ঘটতে পারে। বিশেষ করিয়া ছোট মেয়েদের এবং স্ত্রীলোকদের বোঝা বহনের বেলায় খুব সতর্ক হইতে হইবে। কেননা তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টিগতই খুব নাজুক বা দুর্বল হইয়া থাকে। আমি এইরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি যাহারা বাল্যকালে এবং অসাবধানে অতিরিক্ত যোঝা বহন করিয়াছে, তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া সারা জীবন কষ্টে কাটাইতেছে।

৪০। বড় বা ছোট সূচ বা অন্য কোন চোখা ধারাল বস্তু ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যাইও না, হয়ত অন্য লোক আসিয়া উহার উপর বসিলে বিধিয়া যাইতে পারে।

৪১। অন্য লোকের শরীরের উপর দিয়া কোন ভারী বস্তু বা বিপদজনক দ্রব্য আদান-প্রদান করিও না, হয়ত হাত হইতে ছুটিয়া পড়িয়া বিপদ ঘটতে পারে।

৪২। অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা বা ছাত্ররা যদি কোন অন্যায় করে, তবে তাদের শাস্তি দিতে হইলে মোটা লাঠি দ্বারা আঘাত করিও না, লাঠি, ঘুষি মারিও না। খোদা না করুন যদি বে-জায়গায় চোট লাগিয়া যায়, তবে হিতে বিপরীত হইয়া যাইবে। তদ্রূপ চেহারার উপর বা মাথায় কখনও মারিও না।

৪৩। যদি কোথায়ও বেড়াইতে গিয়া থাক এবং বাড়ী হইতে খানা খাইয়া গিয়া থাক, তবে তথায় যাইয়াই মেজবানকে অর্থাৎ, যার ঘরে মেহমান হইয়াছ তাহাকে জানাইয়া দাও যে, তোমার এখন খাওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা তাহারা হয়ত লজ্জায় তোমাকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, খাইয়া আসিয়াছেন কি না? তাহারা ত তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা করিবেই, সময় থাকুক বা না থাকুক, অসময় হইলেও চুপে চুপে খানা তৈয়ার করিয়া তোমার সম্মুখে হাযির করিবে। তুমি তখন বলিবে যে, আমার ক্ষুধা নাই বা খাইয়া আসিয়াছি, এখন খাইতে পারিব না ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বলতঃ ঐ বেচারাদের প্রাণে কত আঘাত লাগিবে! তবে কেন পূর্বেই বলিলে না?

তদ্রূপ যদি তোমাকে কেহ দাওয়াত করে বা কোথায়ও কেহ খাওয়াইতে অপেক্ষা করে, তবে তুমি আপন বাড়ী হইতে জানাইয়া যাইও। আর যদি কোথায়ও উপস্থিত মত খানা খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করিতে হয়, তবে তোমার নিজ বাড়ীতে খানা পাক করার পূর্বেই সংবাদ পৌঁছাইবে, যেন বাড়ীর লোকেরা তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা না করে।

৪৪। যে লোক খুব সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী বা শ্রদ্ধেয় পাত্র হওয়ার কারণে কথা বলিতে তাহাকে ইজ্জত, আদাব ও সম্মান করিতে হয় এইরূপ লোকের সহিত কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত নয়, কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে না পরিষ্কাররূপে কথা বলা যায়, না মূল্য চাওয়া যায়, না তাগাদা করা যায়। একজনে মনে মনে একটা মূল্য সাব্যস্ত করিয়া রাখে, অপর জনে অন্যরূপ মূল্য ধারণা করে ইহার শেষ ফলে মনোমালিন্য ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

৪৫। চাকু, ব্লেড ইত্যাদি ধারাল বস্তু দ্বারা দাঁত কোড়াইও না।

৪৬। যে সকল ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে তাহাদিগকে বলকারক, মেধা-শক্তি বর্ধক বস্তু ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক খাদ্য খাওয়াইতে থাকিও।

৪৭। রাত্রে কখনও একা ঘরে শুইও না, ইহাতে নানা বিপদ ঘটাবার আশংকা আছে। এমনও হয় যে, একা ঘরে লোক মরিয়া থাকে, শেষে কয়েক দিন পর তার সংবাদ হয়।

৪৮। ছোট ছেলেপেলেদিগকে কুয়ার পাড়ে উঠিতে দিও না, অথবা কুয়ার পানি আনিতে পাঠাইও না। যদি ঘরের মধ্যেই কুয়া থাকে, তবে উহার উপর ঢাকনি দিয়া রাখিও। না হইলে ছোটরা যাইয়া ডোল খিচিয়া পানি উঠাইতে চেষ্টা করিবে এবং কুয়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাইবে।

৪৯। যে সকল শিল, ইট, পাথর বহুদিন একস্থানে পড়িয়া থাকে তাহা হঠাৎ উঠাইও না। কারণ উহার নীচে সাপ, বিছু বা অন্যান্য বিষাক্ত জীব থাকিতে পারে। উহা দেখিয়া শুনিয়া খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করিও।

৫০। বিছানায় শুইবার পূর্বে কাপড় বা তোয়ালে দ্বারা বিছানা ঝাড়িয়া মুছিয়া শুইও। অন্যথায় কোন বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ বা ধূলা-বালি থাকিতে এবং উহার দ্বারা ক্ষতি হইতে পারে।

৫১। রেশমী কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে কাফুর, নেপথালীন, অথবা নিমপাতা ইত্যাদি কোন বস্তু রাখিও, তাহা হইলে পোকায় কাটিতে পারিবে না।

৫২। যদি মাটির নীচে কোথায়ও টাকা-পয়সা বা মূল্যবান কোন অলংকার লুকাইয়া রাখিয়া থাক, তবে তোমার আপন কোন বিশ্বস্ত লোককে জানাইয়া রাখিও। কেননা, খোদা না করুন যদি তুমি কোথায়ও গিয়া মারা যাও, তবে আর উহা পাওয়া যাইবে না।

একদা জনৈক স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর অর্জিত ৫০০ পাঁচশত টাকা মাটির নীচে কাহাকে না জানাইয়া পুতিয়া রাখিয়াছিল, ইতিমধ্যে সে প্রাণত্যাগ করে। অবশেষে সমস্ত ঘর ঢালাইয়াও উহার সম্বন্ধ পাওয়া যায় নাই। পুরুষ লোকটি নিতান্ত গরীব ছিল। দেখ ত টাকা না পাইয়া লোকটির পেরেশানী ও কষ্ট ভোগ করিতে হইল।

৫৩। কোন কোন সময় লোকের অভ্যাস এই যে, আলমারীর বা বাক্সের তালা লাগাইয়া উহার নিকটেই চাবি অসাবধানে ফেলিয়া রাখে। এইরূপ তালা লাগানোতে কোন লাভ নাই। সাবধান! এইরূপ কখনও করিও না। ইহাতে তোমার সর্বস্বাস্তু হইবার ভয় আছে।

৫৪। ঘরে বাতি জ্বালানের জন্য কেরোসিন তেল ব্যবহার না করিয়া বরং চেরাগ বাতি যাহা রেটীর তৈল বা ঐ জাতীয় বীজে যে তৈল পাওয়া যায় সেই তৈলের বাতি অনেক ভাল। কেননা, কেরোসিন তৈল খরচ বেশী এবং নোকছানও হয় খুব বেশী।

অতএব, নিজ হাতে শল্তা বানাইয়া (যাহা বেশী মোটাও নহে এবং একেবারে সরুও নহে) চেরাগ জ্বালাও এবং বাতি বাড়াইবার জন্য একটি শলাকা চেরাগের মধ্যে রাখ। হাতের সাহায্যে বাতি বাড়াইও না। ইহাতে হাত নষ্ট হইতে পারে। চাকর-চাকরাণীদের দ্বারা শল্তা বানাইও না বা তৈল দেওয়াইও না। তাহারা প্রায়ই তৈলের অপচয় করিয়া বড় ক্ষতি করে। চেরাগ নিভাইতে হইলে হাতে নিভাইও না বরং পাংখা বা কাপড় দিয়া ঝটকা দিয়া নিভাইও। ঠেকাবশতঃ ফুঁ দিয়াও নিভান যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে অসুবিধা আছে। হাতে বাতি নিভাইতে গেলে অনেক সময় হাতে লাগিয়া চেরাগ পড়িয়া গিয়া ক্ষতি হইয়া থাকে।

৫৫। রাত্রে টাকা-পয়সা গণনার কাজ করিও না। যদি একান্ত ঠেকাবশতঃ গণনা করিতেই হয়, তবে চুপে চুপে গণিবে যেন আওয়াজ না হয়। কেননা চোর-ডাকাত নিকটেই থাকিতে পারে।

৫৬। দোকান ঘরে বা বসত ঘরে লোক শূন্যাবস্থায় জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া যাইও না। তদ্রূপ দিয়াশলাইয়ের শলাকায় আগুন জ্বলাইয়া উহা অমনি ফেলিও না; বরং পায়ে মাড়াইয়া বা নিভাইয়া ফেল। যেন স্ফুলিঙ্গ না থাকে।

৫৭। ছেলেপেলেদিগকে দিয়াশলাই বা আতশবাজি দ্বারা খেলিতে দিও না। আমাদের মহল্লার একটি ছেলে দিয়াশলাই জ্বলাইতে গিয়া জামায় আগুন ধরিয়া চেহারা ও শরীর পুড়িয়া গিয়াছে। অপর একটি ছেলে আতশবাজি ছাড়ার সময় একখানা হাতই ছিড়িয়া গিয়াছে।

৫৮। পায়খানার মধ্যে বাতি নিয়া অতি সাবধানে বসিও যেন কাপড়ে আগুন ধরিতে না পারে। এইভাবে অসাবধানে অনেক লোক পুড়িয়া যাওয়ার ঘটনা শুনা যায়। বিশেষ করিয়া কেরোসিন তৈলের খোলা বাতিতে খুব বেশী ভয়ের কারণ আছে।

শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে সাবধানতা

১। প্রতিদিন শিশুদের হাত-পা, মুখমণ্ডল, গলা, কান কুচকী ইত্যাদি ভিজা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিও। অন্যথায় তৈলের সহিত ময়লা জমাট বাঁধিয়া ঐ সকল স্থানের চামড়া গলিয়া গিয়া ঘা হইতে পারে।

২। শিশুরা পায়খানা-প্রস্রাব করিলে তৎক্ষণাৎ উহাদের পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দিও। মাটি দ্বারা মুছিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিও না। কেননা মুছাইয়া দিলে পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু দুর্গন্ধ থাকিয়া যায় এবং পায়খানার রস শুকাইয়া যাওয়ায় উহার তেজস্ক্রিয় পদার্থের কারণে ফোকা পড়ে ও খুজলী পাঁচড়া হইয়া থাকে। অতএব, ধোয়াইয়া দেওয়াই উচিত। শীতের দিনে বার বার ধোয়াইলে সর্দি লাগিতে পারে এইজন্য একটু গরম পানি দিয়া ধোয়াইবে।

৩। শিশুদিগকে মায়ের কোলের মধ্যে না শোয়াইয়া বরং একটু দূরে চতুর্দিক উঁচু করিয়া ঠেস দিয়া শোয়াইও। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় মায়ের পাশ ফিরার সময় শিশুরা মায়ের হাত-পা বা পীঠের নীচে পড়িয়া জীবন হারায়। অনেক সময় শিশুর হাত-পাও ভাংগিয়া যাইতে শুনা যায়।

৪। শিশুদিগকে দোলনায় বুলানোর বেশী অভ্যাস করান উচিত নহে। কেননা দোলনা সর্বত্র পাওয়া যায় না এবং উহা সাথে নিয়াও চলা যায় না। তদ্রূপ বাচ্চাকে বেশী কোলে রাখিও না। কেননা বেশী কোলে রাখিলে শিশুদের শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে।

৫। শিশুরা যেন সকলের কোলেই যায়, এই অভ্যাস করান উচিত। কোন এক জনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতে দিও না। কারণ সে যদি চলিয়া যায় বা মরিয়া যায় কিংবা চাকুরী ছাড়িয়া দেয়, তবে শিশুর ভয়ানক কষ্ট হইবে।

৬। শিশুকে যদি ধাত্রী-মাতার দুধ খাওয়াইতে হয়, তবে এমন ধাত্রী নির্বাচন করিয়া রাখিবে যাহার স্বাস্থ্য ভাল, তাজা দুধওয়ালী (অর্থাৎ ৫/৬ মাসের সন্তানের মা হয়,) যে স্ত্রীলোক সংস্কারভাবের ও পরহেয়গার হয় এবং লোভী না হয় এইরূপ মেয়েলোক রাখিও।

৭। শিশুরা যখন খানা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তখন ধাত্রী এবং চাকরাণীর হাতে খানা খাওয়াইবার ভার দিও না। নিজ হাতে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমতী লোকের সম্মুখে খানা খাওয়াইও যেন অধিক খাইয়া অসুস্থ হইয়া না পড়ে। তদ্রূপ শিশুদের অসুখের সময় ঔষধ নিজেই সম্মুখে তৈয়ার করাইয়া নিজেই উপস্থিতিতেই খাওয়ান উচিত।

৮। শিশুদের যখন কিছু বুদ্ধি হয়, তখন উহাদিগকে নিজ হাতে এবং ডান হাতে খাইতে অভ্যস্ত করাইও এবং খানা খাওয়ার পূর্বে হাত মুখ ধোয়াইয়া দিও। অল্প খাওয়ার অভ্যাস করাও যেন রোগ মুক্ত ও লোভ মুক্ত থাকিতে পারে।

৯। শিশুদিগকে যাহাতে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে দিকে মা-বাবার ও চাকর-চাকরাণীর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশুদের হাত পা, নাক-মুখ ময়লা করিলে তৎক্ষণাৎ ধুইয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দিও।

১০। যতদূর সম্ভব শিশুদিগকে ভদ্র ও সৎলোকের ছেলে-মেয়েদের সহিত থাকিতে দিও এবং অসৎলোকদের ছেলেমেয়েদের সহিত মিশিতে দিও না। শিশুদের খেলা-ধুলার সময় লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না দৌড়ায় এবং উচ্চস্থান হইতে লাফ না দেয়। অনেক ছেলেমেয়েদের সহিত খেলিতে দিও না বাড়ীর আঙ্গিনায় বা রাস্তার উপর খেলিতে দিও। শিশুদের লইয়া হাটে-বাজারে ফিরিও না। উহাদের সকল প্রকার অভ্যাস দেখিয়া সুযোগ মত যথাস্থানে রাখিয়া আদব তমিয় শিক্ষা দিও এবং বেহুদা কথা হইতে উহাদিগকে বিরত রাখিবে।

১১। শিশুকে খাওয়াইবার জন্য যে মেয়েলোক রাখা হয় তাহাকে বলিয়া দিও, সে যেন বাচ্চাকে অন্যত্র কোথায়ও কোন কিছু খাবার না খাওয়ায়। যদি কেহ কোন খাদ্য-দ্রব্য দেয়ও, তবে উহা শিশুর মাতার নিকট যেন আনিয়া খাওয়ান হয়। নিজ ইচ্ছা মত যেন না খাওয়ায়।

১২। শিশুদের এই অভ্যাসে অভ্যস্ত করান একান্ত কর্তব্য যে, তাহারা যেন আপন মুরব্বির নিকট ছাড়া অন্য কাহারো নিকট কিছুনা চায়। তদূপ অন্য লোকের দেওয়া বস্তু যেন মুরব্বির হুকুম ছাড়া গ্রহণ না করে।

১৩। ছেলেপেলেকে অত্যধিক আহ্লাদ দেওয়া উচিত নহে। কেননা বেশী আহ্লাদে ছেলেপেলে দুষ্ট হইয়া যায়।

১৪। ছেলেমেয়েদিগকে বেশী খিচা জামা অর্থাৎ টাইটফিট পোশাক পরিধান করাইও না এবং বেশী মূল্যবান পোশাকও দিও না। হাঁ, ঈদের সময় রুচিমত পোশাক দেওয়া উচিত।

১৫। ছেলেপেলেদিগকে মাজন এবং মেছওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যাস করাইও।

১৬। এই কিতাবের অর্থাৎ, বেহেশতী জেওরের সপ্তম খণ্ডে যে সমস্ত আদব-কায়দা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, উঠাবসা ইত্যাদি আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের কথা লিখা হইয়াছে, ছেলেমেয়েদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়া অভ্যাসে পরিণত করাইয়া দিও। এই আশায় কখনও থাকিও না যে, বড় হইলে লেখাপড়ার মাধ্যমে শিখাইয়া দিব। অথবা দেখে শুনে আপনা হইতেই শিখিয়া নিবে। স্মরণ রাখিও, আপনা হইতেই কখনও কেহ শিখিতে পারে না। পড়ার মাধ্যমে হয়ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে কিন্তু অভ্যাস গড়ে না। যতদিন পর্যন্ত ভাল স্বভাবের অভ্যাস না গড়াইবে, যত লেখাপড়াই শিক্ষা দাও না কেন তাহার দ্বারা বেতমিযী, বে-হায়ারী, বেদনাদায়ক দুর্ব্যবহার প্রকাশ পাইবেই। এই সম্বন্ধে অত্র কিতাবের পঞ্চম খণ্ড ও নবম খণ্ডের শেষভাগে যে সকল উপদেশ লেখা হইয়াছে উহার প্রতিও বিশেষ যত্নবান হইবে।

১৭। শিশুদের উপর বেশী পড়ার বোঝা চাপাইও না। প্রথম প্রথম একঘন্টা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিও। তারপর ক্রমাগত সময় বাড়াইয়া নিয়া ২ ঘন্টা ও ৩ ঘন্টা পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করিও। শিশুদের শক্তি ও সহ্য অনুযায়ী পড়ার চাপ দিও। সারা দিনই পড়াইও না, ইহাতে শিশুরা পড়ার পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া আর পড়িতে চাহিবে না। তদুপরি বেশী মেহনতের কারণে মন

মেজাজ খারাপ হইয়া মেধাশক্তি হ্রাস পাইতে পারে এবং রুগ্নের মত অলসতায় পাইয়া বসিবে। পড়া আর মন বসাইবে না।

১৮। ছেলেমেয়েদিগকে যে বিষয়েই শিক্ষা দাও না কেন, সে বিষয়ের পূর্ণ উপযুক্ত ও জ্ঞানী পারদর্শী শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি করিও না। কেহ কেহ সমস্ত ওস্তাদ রাখিয়া ছেলেমেয়েদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে, যাহার ফলে শিক্ষার্থীদের প্রথম হইতেই শিক্ষার ভিত্তি খারাপ হইয়া যায়। শেষে আর ঐ খারাপ ভিত্তি ভাল করা যায় না। উহার সংশোধন অতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

১৯। কঠিন বিষয়ের পড়া ভোরের দিকে এবং সহজ পড়া তৃতীয় প্রহরে রাখিও, কেননা শেষদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত থাকায় কঠিন পাঠের প্রতি তবীয়ত ঘাড়াইয়া যায়।

২০। ছেলেদিগকে, বিশেষতঃ মেয়েদিগকে রন্ধন কার্য এবং যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ অবশ্য শিক্ষা দিও।

২১। বিবাহ-শাদীতে পাত্র-পাত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী পার্থক্য না হয়। কেননা, বয়সের বেশী তারতম্য ঘটিলে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়া দাম্পত্য-জীবন বিষময় হইয়া উঠে।

২২। খুব বেশী অল্প বয়সেও বিবাহ হওয়া অনুচিত। ইহাতে বহু ক্ষতি এবং বাঙাটের সৃষ্টি হয়।

২৩। ছেলেদিগকে খুব ভাল করিয়া বুঝাও এবং তাকিদ কর যে, তাহারা যেন ছোট মেয়েদের ও বয়স্ক স্ত্রীলোকদের সম্মুখে এস্তেজার ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করিয়া হাটা চলা না করে। ইহা বড়ই বে-হায়ারী। এস্তেজার জন্য পর্দার মধ্যেই সকল পবিত্রতা সমাধা করিবে।

কতিপয় জরুরী উপদেশ

১। পুরাতন ঘটনার খোঁটা দেওয়া বড়ই অন্যায় কথা। মেয়েদের অভ্যাস এই যে, সমস্ত বেদনাদায়ক এবং মনকষ্টকর ঘটনা ও বাগড়া-কলহের আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া মাফ দেওয়া-নেওয়া হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ নূতন কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে সেই পুরাতন কাহিনী লইয়া খোঁটা দিয়া দ্বন্দ্ব কলহ বাড়াইয়া তোলে। ইহাতে গোনাহগার ত হয়ই, তদুপরি বেদনাদায়ক কথায় মন ঘায়েল এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

২। স্বামীর বাড়ীর দোষত্রুটি পিত্রালয়ে গিয়া বর্ণনা করিও না। কোন কোন আয়েবের কথা বলার দরুন গোনাহও হয়, বে-ছবুরীও প্রকাশ পায়। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে অবগতার সৃষ্টি হইয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ পিত্রালয়ের অধিক প্রশংসা স্বামীর বাড়ী বসিয়া প্রচার করিতে নাই। ইহাতেও কোন কোন সময় গৌরব করার এবং অহঙ্কার করার গোনাহ হইয়া যায়। তাছাড়া এই ধরনের বাপের বাড়ীর প্রশংসা শুনিয়া শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা মনে করে যে, বৌ আমাদিগকে তুচ্ছভাবে ও ছোট মনে করে। অবশেষে তাহারাও বৌকে সুনজরে দেখে না এবং তুচ্ছ করিতে থাকে।

৩। অযথা কথার বেশী অভ্যাস করিও না। কেননা, অনেক কথার মধ্যে কোন কোন ক্রটির কথাও প্রকাশ পাইয়া বসে, শেষে উহাতে লজ্জিত হইয়া প্রাণে ব্যথা পাইতে হয়। আবার আখেরাতে গোনাহর বোঝা বহন করিতে হয়।

৪। যতদূর সম্ভব নিজের কাজ অপরের দ্বারা করাইও না; বরং নিজ কাজ নিজ হাতে করিয়া অপরেরও কিছু কাজ করিয়া দিও। ইহাতে তোমার ছওয়াব তো হইবেই, তদুপরি তুমি সকলের স্নেহস্পন্দ হইতে পারিবে।

৫। যে সকল স্ত্রীলোক অপর বাড়ীর কথা নিয়া আসিয়া তোমার ঘরে আসর জমাইয়া বসে, তুমি সেই কথায় যোগ দিও না। কেননা, এইরূপ বাজে কথা শুনায় গোনাহ তো হয়ই, তদুপরি কোন সময় ফ্যাসাদও ঘটয়া থাকে।

৬। স্বামীর বাড়ীর কোন ঘনিষ্ঠ লোকের অর্থাৎ শাশুড়ী, নন্দ, জাহ্ ইত্যাদি লোকের বা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের যদি কোন প্রকার দুর্নাম শুনিতে পাও, তবে উহা সত্য মনে করিয়া ইয়াদ করিয়া রাখিও না; বরং যদি এতটুকুন মনোবল না থাকে, তবে যে ব্যক্তি তোমার নিকট তাদের দুর্নাম করিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সামনাসামনি সংশোধন করিয়া লও। ইহাতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি হয় না।

৭। চাকর-চাকরাণীদের উপর সব সময় রাগ করিয়া কঠিন ব্যবহার করিও না। তোমাদের ছেলেপেলেনদের প্রতিও দৃষ্টি রাখিও, তাহারা যেন চাকর-চাকরাণীকে এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে বিরক্ত না করে। কেননা, ইহারা হয়ত তোমাদের প্রভাবের কারণে মুখে কিছু বলিবে না। কিন্তু মনে মনে অবশ্যই যা-তা বলিবে। আর যদি তারা মনে মনে কিছু না-ই বলে বা গালি না দেয়; কিন্তু জুলুমের গোনাহ এবং প্রতিফল নিশ্চয়ই হইবে।

৮। বেহুদা কথায় বা গল্পগুজবে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করিও না। বেশীর ভাগ সময় ছেলেমেয়েদের কোরআন শরীফ ও দ্বীনি কিতাব পড়াইবার জন্য রাখিও। যদি বেশী না পার, তবে অন্ততঃ কোরআন শরীফ পড়ানের পর বেহেশতী জেওর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই পড়াইয়া দিও। তোমার নিজের মেয়ে হউক বা অপরের মেয়েই হউক অবশ্যই মেয়েদিগকে কিছু গুণের কাজ শিখাইয়া দিও। কিন্তু কোরআন শরীফ খতম না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে অন্য কাজ দিও না। যখন কোরআন শরীফ খতম হইবে এবং ভালরূপ পরিষ্কার শুদ্ধ পড়া হইয়া যাইবে, তখন প্রতিদিন ভোরে পড়াইয়া দিয়া ছুটির পর খাইয়া আসিলেও তাহাদিগকে লেখা শিখাইও। বৈকালে ১ প্রহর বেলা থাকিতে মেয়েদিগকে রান্নার প্রণালী এবং সেলাইয়ের কাজ শিক্ষা দিও।

৯। যে মেয়েরা তোমার নিকট পড়িতে আসে, তাহাদের দ্বারা নিজস্ব কোন কাজ করাইও না এবং তোমার ছেলেমেয়ে কোলে লওয়াইও না; বরং তাহাদিগকে তোমার নিজ সন্তানের মত মনে করিও।

১০। সুনাম পাওয়ার জন্য অর্থাৎ যশঃ লিপ্সায় পড়িয়া নিজের উপর কোন কঠিন বোঝা চাপাইও না। ইহাতে গোনাহের গোনাহ, মছিবতে মছিবত হয়।

১১। কোথায়ও যাতায়াতের সময় শাড়ী, পোশাক, অলংকার ইত্যাদি নিয়া বৃথা আড়ম্বরে অভ্যস্ত হইও না। কেননা, ইহাতে গর্ব, অহংকারের লিপ্সা থাকে। অতএব, এইরূপ করাতে বড়ত্বের কামনা করা হয় এবং এই প্রকার ইচ্ছায় গোনাহ হইয়া থাকে। তাছাড়া অধিক সাজ-সজ্জায় ও জাঁকজমকের কারণে যাতায়াতে অযথা বিলম্ব হইয়া যায় ও নানাবিধ বিপদের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং নিজের নম্রতা ও সরলতার স্বভাব গঠন করিতে যত্নবান হইয়া যে কাপড় তোমার পরিধানে আছে, তাহা যদি বেশী ময়লা না হইয়া থাকে, তবে উহা নিয়াই চল।

আর যদি পরিধানের কাপড় বেশী ময়লা হইয়া থাকে, তবে সাধারণ একটা পরিষ্কার কাপড় ঝটপট বদলাইয়া রওয়ানা হও।

১২। কাহারো অন্যায়ে প্রতিশোধ লইতে গিয়া তাহার বংশের বা মৃত ব্যক্তিদের দোষ উদ্ঘাটন করিও না। ইহাতে গোনাহ ত হয়ই তদুপরি অনর্থক অপরের প্রাণে আঘাত হানা হয়।

১৩। কাহারো খালা-বাসন বা হাড়ি-পাতিল যদি ঠেকাবশতঃ তোমার ব্যবহারের জন্য আনিয়া থাক, তবে ব্যবহারান্তে তৎক্ষণাৎ উহা মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। আর যদি একটু দেবী দেখ, তবে তোমার বর্তনাদি হইতে পৃথক করিয়া যত্নে রাখিয়া দাও, যেন কোন ক্ষতি না হয়। তদুপরি ভিন্ন করিয়া রাখার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তুমি যদি ধার আনা খালা-বাসন তোমার খালা বাসনের সহিত একত্রে রাখ এবং উহা পুনঃ ব্যবহার করে বস, তবে বিনা অনুমতিতে ব্যবহার হইবে।

১৪। বেশী ভাল খানার অভ্যস্ত হইয়া পড়িও না। কেননা, চিরদিন এক অবস্থায় যায় না। হয়ত বা কোন সময়ে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হইতে পারে।

১৫। উপকারীর উপকার যত ক্ষুদ্র এবং যত তুচ্ছই হউক না কেন, উপকারীর উপকার ভুলিও না। আর তুমি অপরের যত বড় উপকারই করিয়া থাক না কেন, তাহার প্রতিদান চাহিও না।

১৬। যে সময় তোমার কোন কাজ না থাকে, তখন সবচেয়ে উত্তম কাজ হইল কেতাব দেখা। অত্র কিতাবের শেষভাগে যে সকল কিতাবের নাম লিখিত হইয়াছে সেইগুলি পড়িও। আর যে সকল কিতাব পাঠে মন-মগজ কলুষিত এবং আমল খারাপ হয়, তাহা সর্বদা বর্জনীয়।

১৭। অতি জোরে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কাহাকেও ডাকিও না। তোমার আওয়াজ বাহিরের লোকের কানে যাইবে উহা বড় জঘন্য কথা।

১৮। তুমি যদি রাতে অধিক সময় পর্যন্ত জাগিয়া পড়াশুনা করিতে থাক এবং অপর সকল লোক ঘুমে থাকে, তবে শব্দ করিয়া অপরের ঘুম নষ্ট করিও না। তুমি জাগিয়া রহিয়াছ তোমার কাজে, তবে অপরকে কেন কষ্ট দাও? যে কাজ করিতে হয় নিঃশব্দে কর। আস্তে আস্তে দুয়ার খোল, আস্তে পানি পান কর, আস্তে আস্তে কলসীর ঢাকনী দিও এবং আস্তে দরজা বন্ধ করিও।

১৯। যিনি তোমার বয়সে বড় তাহার সহিত কখনও হাসিও না, ইহা বড়ই বে-আদবীর কথা। তদ্রূপ কম আকলের লোকদের সহিত মজাক করিও না, ইহাতে সে বে-আদব হইয়া যাইতে পারে এবং তাহার বে-আদবী তোমার সহ্য হইবে না বা অন্য কোথাও গিয়া বে-আদবী করিয়া বসিলে লাঞ্চিত হইতে হইবে।

২০। কাহারো সম্মুখে নিজ পরিজনের লোকের বা ছেলেপেলের প্রশংসা করিও না।

২১। কোন মজলিসের লোক যদি সকলেই দাঁড়াইয়া যায়, তবে তুমি একা বসিয়া থাকিও না। উহাতে অহংকার প্রকাশ পায়।

২২। দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যাপারে কলহ থাকিলে তুমি সে ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এমন কোন কথা বলিও না, যদ্বারা তাহাদের মিলমিশ হইয়া গেলে তোমাকে লজ্জিত হইতে হয়।

২৩। যে কাজ অর্থ ব্যয়ের দ্বারা বা নরম কথার দ্বারা উদ্ধার হইতে পারে সেই কাজ করিতে কড়াকড়ি করিয়া বিপদে পড়িও না।

২৪। মেহমানের সম্মুখে কাহাকেও রাগ করিও না। ইহাতে মেহমান যেরূপ খোলাসা মনে বেড়াইতে আসে, তদ্রূপ খোলাসা থাকে না।

২৫। শত্রুর সহিতও ভদ্রোচিত ব্যবহার করিও। উহাতে শত্রুর শত্রুতা বাড়ে না; বরং হ্রাস পায়।

২৬। রুটির টুকরা বা অন্যান্য খাদ্যের অংশ অযত্নে ফেলিয়া রাখিও না। যেখানেই দেখ উঠাইয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া হয় নিজেই খাইয়া ফেল, না হয় কোন জানোয়ারকে দিয়া দাও। যে দস্তুরখানায় খাদ্যের কণাদি রহিয়াছে, উহা লোকজনের চলাচলের পথে ঝাড়িও না এবং পায়ে মাড়াইও না।

২৭। খানা খাওয়া হইয়া গেলেই বরতন না উঠাইতেই তুমি উঠিয়া যাইও না, ইহা বে-আদবী।

২৮। মেয়েদিগকে খুব সাবধান করিয়া দাও, তাহারা যেন ছেলেদের সহিত খেলিতে না যায়। ইহাতে সকলের অভ্যাসই খারাপ হইয়া যায়। যে সমস্ত ছেলেরা অপর বাড়ী হইতে তোমাদের বাড়ী খেলিতে আসে তাহারা বয়সে যত ছোটই হউক না কেন, তাহাদিগকে দেখিয়া যেন তোমার মেয়েরা তথা হইতে সরিয়া পড়ে।

২৯। কাহাকেও হাতে পায়ে কাতুকুতু করিয়া হাসাইও না, ইহাতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতে পারে। আবার কোন সময় বে-জায়গায় ব্যথাও পাইতে পারে। তদ্রূপ মুখেও বেশী হাসিও না। বেশী হাসার কারণে অপরের ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘটতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিও হইয়া যায়। বিশেষতঃ মেহমানদের সহিত উক্তরূপ হাসি-ঠাট্টা করা একেবারেই অনর্থক। যেমন কেহ কেহ বর-যাত্রীদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিয়া থাকে।

৩০। তোমার কোন বুয়ুর্গের শিওরে বসিও না। কিন্তু কোন কারণবশতঃ যদি তিনি হুকুম করেন, তবে তাহার হুকুম পালন করাটাই আদব।

৩১। যদি কাহারো কোন বস্তু ধার আনিয়া থাক, তবে উহা খুব যত্নে রাখিও এবং ব্যবহারান্তে যত শীঘ্র পার পৌঁছাইয়া দাও। এই আশায় থাকিও না যে, সে আসিয়া চাইলে দিয়া দিব বা সে নিজেই নিয়া নিবে। কেননা, তাহার ত জানা নাই যে, তোমার কাজ হইয়াছে কি না, তারপর এমনও হইতে পারে, সে হয়ত লজ্জার কারণে তাকাদা করিবে না এবং নিজের কাজের সময় বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ধার আনা বস্তু যথা সময়ে না পৌঁছাইলে পর এতগুলি খারাবীর সম্ভাবনা আছে। অতএব, এই বিষয় বিশেষ সতর্ক থাকিও। তদ্রূপ টাকা-পয়সা কর্জ আনিলেও যথাসময়ে তাহা পরিশোধ করিতে সচেষ্ট থাকিও।

৩২। বিশেষ ঠেকাবশতঃ রাত্রে কোথাও যাইতে হইলে হাতের ও পায়ের অলঙ্কার খুলিয়া হাতে নিয়া চল। বাজাইতে বাজাইতে পথ চলিও না।

৩৩। কোন ঘরে কেহ যদি জানালা-কপাট বন্ধ করিয়া একাকী থাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যদি তোমার দরকার পড়ে, তবে হঠাৎ তুমি দরজা ধাক্কা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিও না। হইতে পারে সে বে-খেয়ালে উলঙ্গ হইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে পারে। ইহাতে অযথা তাহার আরামের ব্যাঘাত ও মনঃকষ্টের ও লজ্জার কারণ হইতে পারে। অতএব, প্রয়োজন মত তাহাকে আস্তে আস্তে ডাক এবং ভিতরে আসিবার অনুমতি চাও। যদি এজাযত দেয়, তবে ভিতরে ঢুক, অন্যথায ফিরিয়া আস এবং পুনরায় আসিও। হাঁ, যদি ভীষণ ঠেকার কোন প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ডাকিয়া জাগাইয়া লও। যতক্ষণ সে উত্তর না দিবে, ভিতরে যাইও না।

৩৪। তোমার কোন অপরিচিত লোকের নিকট কোন দেশের বা শহরের অথবা কোন গোত্রের দোষ ক্রটি বর্ণনা করিও না। হইতে পারে এই ব্যক্তিই সেই গোত্রের বা সেই শহরের হইয়া থাকিবে, ইহাতে শেষে তোমার লজ্জিত হইতে হইবে।

৩৫। তদূপ কোন কাজের ক্রটি দেখিয়া (সেই কাজ যে করিয়াছে তাহা তোমার জানা নাই) এমন কথা বলিও না যে, কোন বে-অকুফে এই কাজ করিল অথবা এই ধরনের অন্য কোন তুচ্ছ ও ব্যঙ্গমূলক কথা বলিও না। হয়ত বা ঐ কাজ এমন ব্যক্তিই করিয়াছেন যিনি তোমার অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও ভক্তি-ভাজন। শেষে এইকথা জানাজানি হইয়া গেলে তোমার লজ্জার সীমা থাকিবে না।

৩৬। তোমার ছেলেপেলে কোন অন্যায় করিলে কখনো নিজ সন্তানের পক্ষ সমর্থন করিও না। বিশেষ করিয়া বাচ্চার সম্মুখে এইরূপ করাতে বাচ্চার অভ্যাস খারাপ হইয়া যায়।

৩৭। মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পাত্রের দ্বীনদারী পরহেয়গারী ও খোদার ভয় আছে কিনা, নশ্বভাব আছে কিনা, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে। যাহাদের অন্তরে খোদার ভয় আছে তাহারা নিজ স্ত্রীর হক আদায় করে এবং সর্বদা স্ত্রীকে আরামে রাখে। আর যার দ্বীনদারী নাই, সে যত বড় বিত্তশালী বা ধনী হউক না কেন, সে স্ত্রীর হকই বুঝিবে না, স্ত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে না। টাকা-পয়সা খরচাদি ঠিকমত দিবে না। আর যদি দেয়ও, তবে অতি জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়া তারপর কিছু দিবে। ইহাদের মহব্বতও কৃত্রিম হইয়া থাকে। সে জন্য তাহারা স্ত্রীর উপর সম্ভ্রষ্ট থাকিতে পারে না।

৩৮। কোন কোন পর্দানশীন স্ত্রী-লোকদের অভ্যাস যে, তাহারা পর্দার মধ্যে থাকিয়া কাহাকেও ডাকিতে হইলে টিলা বা ইট পাথর নিক্ষেপ করিয়া ইশারা দিয়া থাকে। ইহা কোন সময় অন্যের শরীরেও লাগিয়া যাইতে পারে বা কোন বস্তু ক্ষতিও হইতে পারে। সুতরাং এমন কাজ করা চাই যাহাতে কাহারো তকলীফ না হয়। এইরূপ প্রয়োজনে কোন বস্তু খটমটাইয়া শব্দ করিলেই ত যথেষ্ট হইতে পারে।

৩৯। তোমার নিজ কাপড় চোপড়ে সুই সূতার দ্বারা কোন চিহ্ন বা ফুল ইত্যাদি অঙ্কন করিয়া লইও যেন ধোপা বাড়ী কাপড় উলট-পালট না হইতে পারে। অন্যথায় কাপড় বদলাইয়া আসিলে তুমি অপরের কাপড় পরিলে অপরে তোমার কাপড় পরিল, ইহাতে গোনাহগার হইতে হয়। দুনিয়াবী লোকসান তো আছেই।

৪০। আরবদেশে প্রচলন আছে যে, কেহ কোন বুয়ুর্গের তবারুক পাইতে চাহিলে সেই ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে কাপড় খরিদ করিয়া বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে দু'চার দিন ব্যবহার করিয়া দেওয়ার আবেদন জানায়। তারপর উহা বুয়ুর্গ ব্যক্তি ব্যবহার করিয়া দিলে নিজে আনিয়া তবারুক হিসাবে ব্যবহারে লাগায়। ইহাতে বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের কোন তকলীফ হয় না। তাহা না হইলে যদি বুয়ুর্গ ব্যক্তির নিজ ব্যয়ে তোহফা তবারুক দেওয়া আরম্ভ করেন, তবে তাঁহার চালে-চুলায় মানাইবে না। আমাদের দেশের ভক্তেরা বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের নিকট খুব বেশী ছুওয়াল করিয়া থাকে, ইহাতে কোন কোন সময় তাঁহাদের বিশেষ চিন্তায় পড়িতে হয় এবং তাঁহারা মনে মনে ভাবেন যে, যদি আরবের মত দস্তুর এই দেশে হইত তবে বড়ই ভাল হইত।

৪১। যদি কোন ব্যক্তি আপন উক্তি হইতে কোন কথা বলে, আর তুমি যদি উক্ত কথার সমুচিত উত্তর দিতে চাও, তবে এইরূপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উত্তর দিও না যে, “তুমি ত এইরূপ বল, অথচ অমুকে দেখি ঐ রূপ।” এইরূপ আত্ম-গোপন করিয়া কথার প্রতিবাদ করিও না। ইহাতে

ঐ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া “অমুক ব্যক্তির উপর কর্কশ উক্তি এবং অশ্লীল গালি দিতে পারে। অথচ তুমি গোপন করিয়া যাহার নাম বন্ধে সে হয়ত শুনলে দুঃখিত হইবে। অতএব, সোজা বল যে, “তুমি ত এইরূপ বল, কিন্তু আমি উহার প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ বলিতে চাই।”

৪২। অনুসন্ধান না করিয়া শুধু অনুমানে কাহারো উপর দোষারোপ করিও না। ইহাতে প্রাণে ভিষণ আঘাত হানে।

অর্থ উপার্জনের এবং হস্ত শিল্পের কতিপয় গুণাবলীর কথা

কোন কোন নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোক অন্নবস্ত্রের কষ্টে ও অর্থাভাবে দারুণ বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকে। তাহাদের এই মর্মস্পর্শী দুঃখের সমাধান নিম্নের বর্ণিত দুইটি উপায়ে হইতে পারে। উপার্জনক্ষম পুরুষের সহিত বিবাহিত জীবন যাপনের দ্বারা। না হয় হাতের কাজ অর্থাৎ কুটীর শিল্পের মারফত দুর্চার পয়সা রোজগারের দ্বারা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বিধবা নিঃসহায় স্ত্রীলোকগণ বিবাহ বসা এবং হস্ত শিল্পের কাজে নিন্দা অনুভব করিয়া থাকে। অথচ সমাজের কাহারো পক্ষে এই শরীফদের অভাব মোচন করা সম্ভব নহে। অতএব, এই সহায়হীনদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইবে?

হে সহায়হীনা বিবিগণ! মনে রাখিও পরের উপর কখনও জোর চলে না। কিন্তু নিজ হাত-পা এবং প্রাণের উপর তো খোদা এখতিয়ার দিয়াছেন। তাই মনকে বুঝাও, অন্যের মন্দ বলার প্রতি ভূক্ষেপও করিও না। যদি বিবাহের উপযুক্ত বয়স অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে বিবাহ বসা উচিত। আর যদি বয়স অধিক হইয়া গিয়া থাকে অথবা বিবাহের মত উপযুক্ত বয়স তো আছে এবং বিবাহ বসা খারাপও মনে করে না; কিন্তু তবিয়েতে এই ঝামেলা বরদাশত করিতে চাহে না এবং মন ঘাবড়াইয়া যায়। এমতাবস্থায় কোন পবিত্র শিল্পের মারফত নিজ হাতে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিও। যদি কেহ তোমাকে নিকৃষ্ট মনে করে বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ও হাসি-ঠাট্টা করে, তাহাতে তুমি মোটেই পরওয়া করিও না। ২য় বার বিবাহ বসার উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই এই কেতাবের ষষ্ঠ খণ্ডে সবকথা খুলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন হাতের কাজের বা কুটীর-শিল্পের কাজ করা বর্ণনা করা যাইতেছে।

মা-ভগ্নিগণ! নিম্ন বর্ণিত কাজসমূহ যদি বে-ইজ্জতির কাজ হইত, তবে আর পয়গম্বর (আঃ)-গণ কখনও উহা করিতেন না। তাহাদের অপেক্ষা বেশী ইজ্জত কাহারো হইতে পারে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে আমাদের প্রিয় নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে বকরী চরাইয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, এমন কোন পয়গম্বর দুনিয়াতে আসেন নাই যিনি বকরী না চরাইয়াছেন।

রাসূলুল্লাহু ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, নিজ হাতে অর্জিত হালাল উপার্জনই সর্বাপেক্ষা উত্তম উপার্জন।

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে অর্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

আমাদের নূরনবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাছাড়া পয়গম্বর আলাইহিসসালামগণের কথা কোরআন পাকেও বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া পয়গম্বর আলাইহিসসালামগণের জীবনী যে সকল কেতাবে লিখিত আছে, সে সকল কেতাব

হইতেও অল্প কয়েকজনের নাম এবং তাঁহারা যে কাজ করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

কতিপয় আশ্বিয়া (আঃ) ও বুয়ুর্গ য়াহারা স্বহস্তে জীবিকা উপার্জন করিতেন

হযরত আদম (আঃ) কৃষিকাজ করিয়াছেন। তিনি আটা পিষিয়াছেন ও রুটি বানাইয়াছেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) লেখার কাজ এবং দর্জির কাজ করিয়া গিয়াছেন।

হযরত নূহ আলাইহিস্‌সালাম গাছ ফাড়িয়া তক্তা বানাইয়া নৌকা গড়িয়াছেন অর্থাৎ তিনি মিস্ত্রীর কাজ করিয়াছেন।

হযরত হুদ (আঃ) ও হযরত ছালেহ (আঃ) তেজারতির কাজ করিয়াছেন।

হযরত জুলকরনাইন যিনি বহুত বড় বাদশাহ ছিলেন, অনেকের মতে তিনি নবী ছিলেন। তিনি জাম্বিল বুনন করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ডালা, টুকরী ধামা, আগৈল প্রভৃতির ন্যায় বস্ত তৈয়ার করিতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কৃষিকাজ এবং রাজ-মিস্ত্রী কাজ করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে খানায় কাঁআবা পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন।

হযরত লুৎ আলাইহিস্‌সালাম চাষ আবাদের কাজ করিয়াছেন। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্‌সালাম তীর-ধনুক দিয়া হাত সই করিয়াছেন। হযরত ইসহাক আলাইহিস্‌সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্‌সালাম এবং তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বকরী পালিতেন এবং বকরীর বাচ্চা বিক্রয় করিতেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-শস্যের ব্যবসা করিয়াছেন।

হযরত আইয়ুব (আঃ) উট ও বকরী পালিতেন ও উহাদের বাচ্চা হইয়া বড় হইত। তিনি কৃষি-কাজ করিয়া তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বাড়ীতে বকরী পালা হইত। হযরত মুসা (আঃ) কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার বাড়ী থাকিয়া বকরী চরাইয়াছেন এবং বকরী চরাণের মজুরীই তাঁহার বিবাহের মহর ধার্য হইয়াছিল।

হযরত হারুণ (আঃ) ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম ক্ষেত-খামারের কৃষিকাজ করিয়াছেন।

হযরত দাউদ (আঃ) যুদ্ধের জন্য লৌহ বর্ম তৈয়ার করিতেন, অর্থাৎ কামারের কাজ করিয়া লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হযরত লোকমান (আঃ) বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বকরীও চরাইতেন।

হযরত সেলায়মান জাম্বিল বুনাইতেন। হযরত জাকারিয়া কাঠ-মিস্ত্রীর কাজ করিতেন। দুনিয়ার সকল পয়গম্বর এবং আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর বকরী চরাণের কথা কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁহাদের জীবনধারণ বকরী চরাণের উপরই নির্ভর করিত না, তবু এই কাজ তাঁহারা করিয়াছেন। উক্ত কাজে তাঁহারা আয়েব মনে করিতেন না। তাহা ছাড়া যে সকল বড় বড় ইমামগণের লিখিত কেতাবের মাসআলা হইতে শরীঅতের আইনের ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, সেই সকল ইমামগণের কেহ কাপড় বুনিয়াছেন, কেহ চামড়ার কাজ করিয়াছেন, কেহ মিঠাই বানাইয়াছেন, অথচ তাঁহাদের চাইতে অধিক সম্মানী কে হইতে পারে ?

জীবিকা অর্জনের কতিপয় সহজ উপায়

নিম্নলিখিত কাজসমূহের দ্বারা সহজে জীবিকা উপার্জন করা যাইতে পারে। যথা—সাবান প্রস্তুত করা, গুটা বুনান, চিক্ণ কাজ, জালি বুনান, কমর বন্ধ বা দোয়াল বানান, সূতার বোতাম তৈয়ার করা, সূতি বা পশ্মী মোজা বুনান, জাম্পার ও মাফলার তৈয়ার করা, টুপি, ছদরিয়া, ব্লাউজ ও জামা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করা, লেখার কালি তৈয়ার করা, কাপড় রংগানের কাজ করা।

শতরঞ্জির উপর নক্সা করা, টুপীর উপর নক্সা করা। আর যদি সেলাইয়ের কল খরিদ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরও দ্রুত কাজ হইতে পারে এবং আনেক লাভ হইবার কথা। আজ-কাল অল্প মূল্যেই সেলাইয়ের কল সংগ্রহ করা যায়। ইহাছাড়া হাঁস মুরগী ও কবুতর পালিয়া উহাদের আণ্ডা বা বাচ্চা বিক্রি করা, রেহাল, টোঁকি, সিন্দুক ইত্যাদি রংগান, মেয়েদিগকে বালিকা মস্তব করিয়া পড়ান, চরকায় সূতা কাটা, সূতা ও তুলা বিক্রয় করা, সূতা কাটিয়া নেওড় (ফিতা) বুনান, কাপড় বুনাইয়া বিক্রি করা, ধান কিনিয়া চাউল তৈয়ার করা, চিড়া কোটা, মুড়ি ভাজিয়া বিক্রি করা, কেতাব জেলদ করা, চাটনী, আচার, মোরব্বা বানাইয়া বিক্রি করা, দড়ি বুনান, টোঁকি তৈয়ার করা ও উহাতে নক্সা করা, দড়ি পাকান, বেতের চেয়ার, টেবিল, ব্যাগ, বাস্ক ইত্যাদি তৈয়ার করা, বাঁশের ডালা, খালই, চালুনি, ঝাড়নি ইত্যাদি তৈয়ার করা, বিভিন্ন প্রকারের চূর্ণ ঔষধের বড়ি তৈয়ার করা, যথা—নিমকে সোলেমানী তৈয়ার করা, সুরমার পাথর চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা, শরবতে আনার, শরবতে ওলাব, শরবতে ফোলাদ, ছিরকা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা। স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্মিত ভারের গুটা অর্থাৎ পাতলা লেছ তৈয়ার করিয়া ব্যবসা করা, হাড়ি পাতিল কলাই করা, খেজুর পাতার চাটাই বানান, তাল পাতার পাংখা তৈয়ার করা, কাপড়ে ছাপা রং করা, যেমন জায়নামায, দস্তুরখানা, রুমাল, পাগড়ী ইত্যাদিতে ছাপার রং দেওয়া হইয়া থাকে। ফসলের মওসুমের সময় কিছু কিনিয়া রাখিয়া পরে মূল্য বাড়িয়া গেলে বিক্রি করা, সুরমা পিষিয়া উহার সহিত কোন উপকারী ঔষধ মিশাইয়া পুরিন্দা করিয়া বিক্রি করা, তামাক প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, বিস্কুট এবং পাউরুটি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, সূতার ডুরী পাকান, রাং অথবা মুক্তা চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা এবং এইরূপ হালকা ও চালু বহু কাজ আছে যেটার সুবিধা-সুযোগ হয় করিবে। কতকগুলি কাজ এমন আছে যাহা না দেখিয়া বুঝে আসে না। সেইরূপ কাজ কোন জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে শিখিয়া লইবে। কোন কোন কাজ এমনও আছে যাহা শুধু কেতাব পড়িয়া করা যায় সেইরূপ কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অর্থকরী শিল্পের নিয়ম পদ্ধতি লিখা হইতেছে। নবম খণ্ডে চূর্ণ, নিমক সোলেমানী, রাস্ত এবং মুক্তা ভস্ম প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডে অতীব প্রয়োজনীয় শিল্প কাজের কথা লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী

সাবান প্রস্তুতের প্রাচীন নিয়ম :

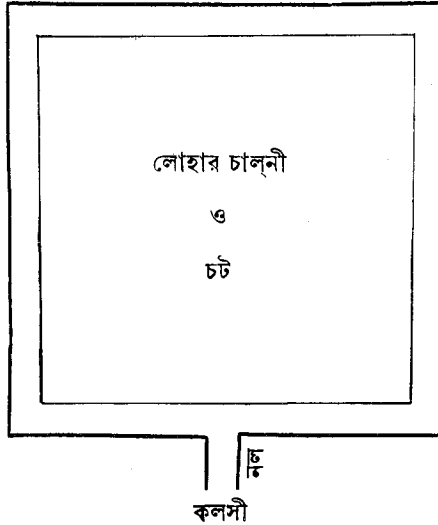
উপাদান—সাজি মাটি এক মণ, চুনা এক মণ, এড়ু তৈল নয় সের, চর্বি সতর সের। প্রথমে পরিষ্কার স্থানে সাজি মাটি রাখিয়া, ঢেলা থাকিলে গুড়া করিয়া উহার সহিত চুনা উত্তমরূপে

মিশাইবে। গোটা গোটা থাকিলে একটু পানির ছিটা দিলেই নরম হইয়া যাইবে। একটা পাকা হাউজ তৈয়ার করিয়া নিবে, না হয় একটা গভীর সমতল পাত্রের ব্যবস্থা করিবে। উহার মধ্যে চার কোণায় চারটি ইট রাখিয়া তাহার উপর একটা বড় ছিদ্র বিশিষ্ট লোহার জাল বিছাও এবং জালের উপর একটা চট বিছাও যাহা উক্ত হাউজের বা পাত্রের কিনারার বাহিরেও কিছু অংশ বুলিয়া থাকে। আর যদি লোহার জাল না পাও, তবে বাঁশের বুনান চালুনী হইলেও হয়। উহার উপর চট বিছাও, এখন চুনা ও সাজি-মাটি চটের উপর রাখিয়া দাও এবং কিছু পানি ছিটাইয়া দাও যেন উহা হইতে আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকে।

নীচের হাউজের একদিকে একটা ছিদ্র পথে নল দ্বারা উক্ত আরক কলসীতে ভরিবে। ক্রমাগত পানি দিতে থাকিবে, আর আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। ১ম বারের আরক লাল বর্ণের হইবে। অতঃপর ২য় বারের আরক কিছুটা সাদা হইয়া আসিবে, তারপর একেবারে সাদা পানি যতক্ষণ না নিংড়াইবে চুনার উপর কতক্ষণ পর পর পানি ছিটাইতে থাকিবে এবং সকল পানি বিভিন্ন কলসীতে ভরিয়া রাখিবে। শেষে সাদা পানি বাহির হইতে থাকিলে চুনা যাহা থাকিয়া যাইবে উহা নাড়াচাড়া দিয়া টপকাইয়া সমাপ্ত করিবে এবং ১ম পানি, ২য় পানি ও ৩য় পানি ভিন্ন ভিন্ন কলসীতে রাখিবে। শেষের সাদা পানি এক কলসীর বেশী রাখিতে হইবে না। পানি ভিন্ন ভিন্ন না রাখিলেও চলে, শুধু শেষের পানি এক কলস রাখিলেই চলিবে।

পাকা হাউজের নক্সা—

পাকা হাউজ



এখন চুল্লীর উপর বড় কড়াই বসাইয়া উহার মধ্যে এক লোটা পরিষ্কার পানি ঢাল এবং জ্বাল দিতে থাক। উক্ত পানির সহিত চর্বি এবং তৈলও কড়াইয়ে ঢাল। উত্তপ্ত হইলে পর বরানো পানি যাহা শেষবারের এক কলস রাখা হইয়াছে তাহা এক লোটা করিয়া কড়াইর মধ্যে দিয়া কষাইতে থাক, এইরূপে ধীরে ধীরে সকল পানি কষাইয়া শেষ কর। যখন জ্বাল দিতে দিতে ও নাড়িতে নাড়িতে ঘন হইয়া যাইবে, তখন হাতল দ্বারা সাবানের কেওয়াম উঠাইয়া হাতে ধরিয়া দেখ যে, হাতে লাগিয়া যায় কি না। যদি লাগিয়া যায়, তবে আরও জ্বাল দাও এবং শক্ত কর। যখন দেখিবে যে, আর হাতে লাগে না এবং বড়ি পাকাইলে শক্ত হইয়া যায়, তবে তখনই চুলার আগুন কমাইয়া

ভিতরের সকল কয়লা সরাইয়া ফেল। তারপর একটা হাউজ, হয় তক্তা দিয়া না হয় ইট দিয়া বানাইয়া উহার মধ্যে চট বা পুরাতন খাতা যাহা ছিঁড়া ফাঁড়া নহে বিছাইয়া উহার উপর সাবানের খামীর অল্প অল্প শুকাইয়া ফেল, তারপর কাটিয়া কাটিয়া রুচিমত সাইজ বানাইয়া লও। বস, সাবান তৈয়ার হইয়া গেল।

যে চুলায় সাবান পাকান হইবে তাহার আকৃতি এইরূপ হইবে, ইহাতে সকল দিকে সমান তাপ লাগে। অল্প সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে হাউজের দরকার নাই।

যে হাউজে সাবান ঢালিবে তাহা যদি তক্তা দ্বারা তৈয়ার করিতে চাও, তবে উহার চারিধারে ইট দ্বারা ঠেস্ দিও যেন ছুটিয়া না যায়। আর পাকা হইলে ত কথাই নাই।

সাবান প্রস্তুত করিতে যে সকল বর্তনাদির দরকার হয় তাহার বিবরণঃ

পোলাও পাকানের হাতার মত একটি বড় বাটযুক্ত লোহার অথবা কাঠের হাতা, একটি তিন সের পানি ধরার মত বড় পট্ যাহার সহিত লম্বা বাট থাকিবে; উহা দ্বারা আরক ঢালিতে উঠাইতে সহজ হইবে। সাবান পাক হইলে পর কড়াই হইতে নামাইবার জন্য ডাবা বা একটি বড় উকরী রাখিবে। যেমন পোলাও বাড়ার জন্য রাখা হয়।

সাবান প্রস্তুতের আধুনিক পদ্ধতিঃ

বর্তমান যমানার অনতিকাল পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই সাজি মাটি, চুনা ও তেলের দ্বারা সাবান প্রস্তুত হইত। উহার নিয়ম প্রণালী যেমন কঠিন এবং মালও ভাল তৈরি হইত না, উহাকে কাঁচা সাবান বলা হইত।

বর্তমানে বিভিন্ন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাবান শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজকাল সাবান প্রস্তুতের প্রণালী অতীব সহজ এবং মহোপকারী আবিষ্কার প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উহার মধ্যে কাপড় কাঁচা সাবান প্রস্তুত করা অতি সহজ যাহা প্রতি ঘরেই অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই বিষয় কিছু লেখা যাইতেছে।

যদি কাহারো অন্যান্য প্রকার সাবান প্রস্তুত করার ইচ্ছা থাকে, তবে পুস্তক প্রণেতার নিকট হইতে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়ম জানিতে পারা যাইবে।

বিলাতী সাবান দুই নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক প্রকারকে কাঁচা বা কোল্ড প্রসেস, অপরটিকে পাকা বা হার্ড প্রসেস বলে। পাকা সাবান প্রস্তুত করা যদিও একটু কঠিন, কিন্তু কাঁচা সাবানের তুলনায় মূল্য কম এবং অতি অল্প ক্ষয় হয়, আর কাপড় খুব পরিষ্কার করে।

প্রথম প্রথম সাবান প্রস্তুত করিতে গিয়া হয়ত দু'চার বার খারাপ হইতে পারে কিন্তু শেষে তৈয়ারের অভ্যাস হইলে পর ইহা বড়ই লাভজনক।

উক্ত সাবান প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিস দরকার। একটি তৈল, অপরটি কষ্টিক। কষ্টিক এক প্রকারের সাদা ধবধবে অতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। উহা গুঁড়াও থাকে এবং আস্তও পাওয়া যায়। আস্তগুলি টুকরা করিয়া লইতে হয়। উহা হাতে ধরা যায় না। কষ্টিক সাধারণতঃ শহরের বড় বড় বেনেতী দোকানে পাওয়া যায়। মূল্যও তত বেশী নয়। মাত্র এক টাকা বা পাঁচ সিকা সের। গুঁড়া কষ্টিকের নাম ৯৮+৯৯ এর কষ্টিক। আস্ত কষ্টিকের নাম ৬০+৬২ এর কষ্টিক। ২য় প্রকারের কষ্টিকের মূল্য কম।

সাবান প্রস্তুতের পূর্বে কষ্টিক পানিতে ভিজাইয়া গলাইয়া নিতে হয়। গলিত কষ্টিককে লাই বলা হয়। ৯৮+৯৯ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি আড়াই সের পানি দেওয়া হয় এবং

৬০+৬২ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি দুই সের পানি দেওয়া হয়, তবে উহাতে ৩৫ ডিগ্রির লাই তৈয়ার হয়। কিন্তু কষ্টিকের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার উপর ডিগ্রির পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, ৩৫ ডিগ্রির স্থলে ৩৩ অথবা ৩৪ ডিগ্রির লাই হইয়া যায়। আবার কখনও ৩৬ বা ৩৭ ডিগ্রিও হইয়া পড়ে, যাহা পাকা সাবানে ব্যবহারে তদ্রূপ কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। কিন্তু উচ্চ ডিগ্রির লাই কাঁচা সাবানে ব্যবহৃত হইলে কিছু ক্ষতি হইয়া যায়। সাবানের কারখানায় লাইয়ের ডিগ্রি দেখিবার হাইড্রোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র থাকে, যাহা তিন চার টাকার মধ্যে খরিদ করা যায়। উহা দ্বারা ডিগ্রির সঠিক প্রমাণ নির্ধারণ করা যায়।

সাবানের উপাদানের তালিকা

তালিকা নং-১

চর্বি ১৫ সের, ২৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই ১২।।০ সের, সোডা ১২।।০, পানি ১২।০ সের।

তালিকা নং-২

চর্বি ১৫ সের; বাহরোয়াহ্ ১২।।০ সের; ৩৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই ১৩।।০ সের; সোডা ১৩।।০ সের; পানি ১৪ সের।

প্রস্তুতের নিয়ম

প্রথমে চর্বি গলাইয়া নেকড়ায় ছাকিয়া লইবে। যদি বাহরোয়াহ্ মিশাইতে হয়, তবে চর্বির সহিত গলাইয়া নেকড়ায় ছাকিয়া নিবে। অতঃপর চুলার উপর কড়াই বসাইয়া পানি দিবে এবং সোডা মিশাইয়া আগুনের তাপ দিতে থাকিবে, যখন বলক আসিয়া সোডা গলিয়া যাইবে, তখন চর্বি ও কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিয়া হাতল দ্বারা খুব নাড়িতে থাকিবে এবং হালকা তাপে পাক করিতে থাকিবে। পাক হইতে হইতে যখন খুব ঘন ও থকথকে হইয়া ছিদ্র হইয়া পানি উপরে উঠিয়া আসে এবং বুদ্ধবুদ্ধ বাহির না হয়, তখন মনে করিবে যে পোড়া লাগার সময় হইয়াছে। তখন এক পোয়া অনুমান কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিবে। উত্তাপ পাইয়া যখন কচি গাইয়ের নূতন দুধের মত কাটা কাটা দাগ পড়িবে, তখন মনে করিবে যে ঠিক আছে এবং আরও একটু জ্বাল দিতে হইবে। পুনরায় একটু কষ্টিকের পানি দিয়া ভালমতে ফাটাইয়া পাকাইলেই উত্তম সাবান প্রস্তুত হইবে। এইরূপে হালকা তাপে ২/৩ ঘন্টা পর্যন্ত জ্বাল দিলে মধুর ন্যায় ঘন হইয়া যাইবে। ভালরূপ গাঢ় না হইলে আরও এক পোয়া চর্বি ঢালিবে এবং জ্বাল দিয়া জমাট বাঁধাইতে হইবে। অতঃপর রুচি মত ছাঁচে ঢালিয়া সাইজ মত সাবান তৈয়ার করিয়া নিবে।

—(মীর মাআছুম আলী সাহেব, খয়ের নগর, মীরাট; ইউ, পি)

কাপড়ে ছাপা রং করিবার নিয়ম

জরদ রং প্রস্তুতের নিয়ম : একসের পানির মধ্যে এক পোয়া 'নাগুরী গুন্দ' ভিজাইয়া গলাইতে হইবে। ছয় মাশা ঘি ও ছয় মাশা গৈঁহুর আটা ভালরূপে মিশাইয়া উহার মধ্যে এক পোয়া হিরার কস এবং তিন মাশা 'গুলিছোরখ টোল' উত্তমরূপে মিশাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইবে। অতঃপর খুব গাঢ় করিয়া উহা দ্বারা কাপড়ে ছাপা রং দিবে। এই রং এক খণ্ড কাপড়ে লাগাইয়া উহার উপর কাঠের ছাপ চাপা দিয়া রং জড়াইবে এবং যে কাপড়ে লাগাইবে উহা সমান টোকির উপর রাখিয়া লইবে। কাপড়টির नीচে চট বা কম্বল বিছাইয়া লইলে ছাপ উত্তম হইয়া থাকে। কাঠের ছাপার ছাঁচ মিস্ত্রীদের দ্বারা তৈয়ার করা যায় অথবা বাজারে খরিদ করিতেও পাওয়া যায়।

কাল রং প্রস্তুতের নিয়মঃ এক ছটাক বিলাতী রং—যাহাকে পেড়ি বলে, উহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এক পোয়া 'নাগুরী গুন্দ', একসের পানিতে ভিজাইয়া লাল প্রস্তুত করিবে এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। উহার সহিত এক ছটাক পটাস, ছয় মাশা তুতিয়া, ছয় মাশা গৈঁছর আটা এবং ছয় মাশা ঘি উহার সহিত খুব ভাল মত মিশাইয়া গাঢ় রং প্রস্তুত করিয়া কাপড় ছাপাইবে।

লেখার কালি প্রস্তুত প্রণালী

বাবলার আঠা এক সের, কাজল এক পোয়া, ফিটকারী ছয় মাশা, বাবলার ছাল এক ছটাক, আমের ছাল এক ছটাক, মেহেদি গাছ এক ছটাক, তুতিয়া এক ছটাক।

দেড় সের পানির সহিত আঠা গলাইয়া কাজল খুব ভালমত মিশাইবে। উল্লিখিত গাছের ছালসমূহ এক সের পানির সহিত জ্বাল দিয়া কাথ বানাইয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। অতঃপর কাজল মিশান আঠার পানির সহিত খুব মিশাইবে; তারপর তুতিয়া, ফিটকারী, খয়ের এক ছটাক পানিতে মিশাইয়া উহা কাজল ও আঠা মিশ্রিত পানির সহিত মিশাইয়া লোহার কড়াইয়ের মধ্যে রাখিয়া খুব ঘুটিবে। ইহা কোন পাত্রে ঢালিয়া পাতল করিয়া শুকাইয়া নিলেই কালি প্রস্তুত হইয়া গেলে।

ইংরেজী কালি তৈয়ার করিবার নিয়ম

প্রথম শ্রেণীর নীল রং এক তোলা, বেগুনী রং এক তোলা, সোডা ১০ মাশা, ১০ তোলা পানির সহিত সোডা এবং দুনো প্রকারের রং মিশাইয়া গরম করিবে, তবেই ইংরেজী কালি তৈয়ার হইবে।

কাঠের আসবাব-পত্র বার্নিস করার নিয়ম

কাঠে যে রং দিবার ইচ্ছা হয়, সেই রংয়ের গুঁড়া বাজার হইতে আনিয়া তাপিন তৈলের সহিত খুব গাঢ় করিয়া মিশ্রিত করিবে, ইহা ব্রাস দ্বারা না হয় কাঠ বিড়ালীর লেজ অথবা কাঠের সহিত নেকড়া বাধিয়া বা পাখীর পালক দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী সাদাসিধা না হয় ফুল-বুটা ইত্যাদির নকশা করিয়া রং লাগাইবে। শুষ্ক হওয়ার পর বার্নিসের তৈল পালিশ করিয়া শুকাইয়া নিলেই আশ্বে আশ্বে চমকদার হইয়া উঠিবে।

বাসন-পত্র কালাই করার নিয়ম

এক পোয়া নিশাদল, তিন ছটাক পানিসহ একটি পাত্রে নিয়া পানি শুকাইয়া যাওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিবে। শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে নামাইয়া গুঁড়া করিবে। যে বরতন কালাই করিতে হইবে, উহা ভালরূপে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া নিবে। তারপর উহাকে আগুনের উত্তাপে খুব উত্তপ্ত করিয়া কার্পাস তুলার সাহায্যে নিশাদল চূর্ণ উক্ত বর্তনে মুছাইয়া দিয়া কালাই করার সামান্য রং উহাতে দিয়া তুলার দ্বারা সমস্ত স্থানে এমনভাবে ছড়াইয়া মুছাইয়া দিবে যাহাতে সকল স্থানে সমানভাবে রং লাগিয়া যায়। কালাই হইয়া গেলে বর্তনটা সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পর উহা ঠাণ্ডা হইলেই কালাই হইয়া গেল।

তামা-পিতল ঝালাই করার নিয়ম

কাঁসা চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ সোহাগা চূর্ণ লইয়া উভয় বস্তু খুব মিশ্রিত করিয়া একটি পাত্রে রাখিবে। যে হাড়ি বা পাতিলের ফাটা জোড়ান বা তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আর তাহাতে যদি পূর্বের কোন তালি দেওয়া থাকে, তবে আগুনে উত্তাপ দেওয়ার পূর্বেই আগের জোড়া বা

ফাটা স্থানে কাদা মাটির দ্বারা পূর্ণ করিয়া এমনভাবে জুড়িয়া দিবে, যেন ছুটিয়া না যায়। অতঃপর যে স্থানে টাক লাগিল বা ফাটা জোড়ানের প্রয়োজন, সে স্থানে বর্তনের ভিতর দিক দিয়া কাঁসা চূর্ণ লাগাইয়া দিয়া খুব উত্তাপ দিবে, (টাকের স্থানটা আগুনের একটু উপরের দিকে থাকা ভাল) যখন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া যাইবে, তখন আগুনের তাপের এক পার্শ্বে সরাইয়া ধরিবে, তবেই কাঁসার গুঁড়া গলিয়া কাটা স্থান জুড়িয়া যাইবে বা টাক জোড়া লাগিবে। ইহাকে পাকা ঝালাই বলে। ইহা ছাড়া কাঁচা ঝালাই এবং তালি লাগানেরও ব্যবস্থা আছে। যে পাতিল বা বরতনে জোড়া দিতে হইবে উহার বাহিরের দিকটা খুব পরিষ্কার করিয়া দিবে। অতঃপর একটু এসিড ঐ স্থানে লাগাইয়া উত্তপ্ত হাতল দ্বারা রাং লাগাইয়া উক্ত ফাটার উপর ধরিবে বা টাকের চার দিকে রাং লাগাইয়া দিবে। তাহা হইলেই জোড়া লাগিয়া যাইবে। টাকটি একটু চাপিয়া ধরিয়া রাং লাগাইবে অন্যথায় তাড়াতাড়ি এবং অল্প রাং-এ জোড়া লাগান দুষ্কর। ঝালাই করা স্থান উঁচু নীচু থাকিলে রেত দ্বারা ঘষিয়া সমান করিয়া দিবে।

তামাক প্রস্তুতের নিয়ম

যেই প্রকারের তামাক তবীয়তে চায় তাহা খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিবে এবং (শীরা) বার বা চিটাগুড় শীতকালে সমপরিমাণ, গরমের দিনে সমপরিমাণের চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক এবং বর্ষাকালে সমপরিমাণের চেয়ে কিছু কম মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কাহলে বা ঢেঁকিতে কুটিবে। অল্প তামাক হইলে হাতেই মাখাইতে হয়। ইহাতে বড় পরিশ্রম, তাই তামাক মাখার মজুরী দিয়া কোন দোকানদারের দ্বারা না হয় মজুরের দ্বারা কেটান যাইতে পারে।

খোশবুদার তামাক প্রস্তুতের নিয়ম

লবঙ্গ, জটা মাংসী, চন্দন কাঠের গুঁড়া, বড় এলাচী, সোন্দা, দারুচিনি, বাউবীর হেনা আতর ইত্যাদি সুগন্ধি বস্তু সমপরিমাণ লইবে। প্রতি সের তামাকের সহিত অর্ধ ছটাক মিশ্রিত সুগন্ধি এবং তিন চার মাসা হেনার আতরও মিশাইবে। ইহা সাদা তামাকের সহিতও মাখান যায় আবার মাখা তামাকের সহিতও মিশান যায়।

সহজ প্যাচ্য সুজির রুটি প্রস্তুতের নিয়ম

সুজির সহিত পানি মিশাইয়া খুব ছানিবে, বেশী নরম যেন না হয়। অতঃপর পেড়া বানাইয়া একটি পাত্রে আন্দাজ মত পানি লইয়া উক্ত পেড়া আধা সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া পানি ফেলিয়া দিবে। তারপর পেড়াগুলিকে ভাংগিয়া উহার সহিত এই পরিমাণ ঘি মিশাইয়া ছানিয়া নিবে যেন একটু নরম হইয়া যায়। তারপর রুটি বানাইয়া পানি ও ঘি ছাড়া তাওয়ায় করিয়া হাল্কা তাপে গরম করিয়া নিবে। রুটিগুলি মোটা বানাইবে না। এই রুটি অনেক দিন স্থায়ী হয়।

গোশত পাকাইবার নিয়ম যাহা ছয় মাসেও খারাপ হয় না

১নং—যে সকল মসল্লা গোশতে দেওয়া হইবে তাহা ভাল মত পিষিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া নিবে। অতঃপর এক পোয়া গোশতের জন্য এক ছটাক ঘি লইয়া উহাতে পঁয়াজ ভুনিয়া পরিমাণ মত লবণ এবং কিছু কাচরী (ফল বিশেষ) গোশতের সহিত লইয়া ঘির মধ্যে ছাড়িয়া দিবে এবং পাতিলের মুখ ঢাকনা দিয়া বন্ধ করিয়া হাল্কা আগুনে পাকাইতে থাকিবে। গোশতের টুকরাগুলির মধ্য হইতে যে পর্যন্ত স্বাভাবিক পানি একেবারে শুষ্ক হইয়া না যায় ততক্ষণ জ্বাল দিতে থাকিবে। পানি শুষ্ক হইয়া গোশত সিদ্ধ হইয়া গেলে উহা ঘি হইতে পৃথক করিয়া নিয়া উক্ত ঘির মধ্যে আরও এক ছটাক ঘি ঢালিবে। অতঃপর মসল্লার গুঁড়া ঘির মধ্যে আধ ভুনা করিয়া গোশত দিবে

এবং নিয়মিতভাবে পাক শেষ করিবে। কিন্তু কোন মতেই পানি দেওয়া চলিবে না। পাক সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে কিছু গরম মসল্লাও দিবে। এখন দেখা গেল যে, এক পোয়া গোশতে আধ পোয়া ঘি খরচ হইল। গোশতে যদি ঘি বেশী মনে হয়, তবে উহা হইতে কিছু ঘি উঠাইয়া রাখিয়া অন্য কাজে লাগাইবে। পাকান গোশত তুলার উপর হইতে গরম গরম নামাইয়া ঢাকনাসহ তুলার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে। না হয় গোশতের পাতিলের চতুর্দিক তুলা দ্বারা মোড়াইয়া রাখিবে। গরমের দিনে প্রত্যহ এবং শীতের দিনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন খুব গরম করিয়া তাড়াতাড়ি পূর্বের ন্যায় তুলার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে।

গোশত পাকানের ২য় নিয়ম

১নং নিয়মানুযায়ী মসল্লা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, অতঃপর ১ নং নিয়মানুযায়ী এক পোয়া গোশতের জন্য এক ছটাক ঘি লইয়া পঁয়াজ ভুনিয়া নিমক এবং কাচরী দিবে। অতঃপর পানি ব্যতীত ১ নং নিয়ম মত ঐ ঘির মধ্যে গোশত ছাড়িয়া ডেক্সির মুখ বন্ধ করিয়া হাল্কা তাপে ভুনিবে, গোশতের টুকরাগুলির সৃষ্টিগত পানি যে পর্যন্ত না শুষ্ক হইয়া যাইবে ততক্ষণ জ্বাল দিবে। যখন দেখিবে যে, গোশতের টুকরা হইতে ফেনা বা বুদ্ধবুদ্ধ উঠে না, তখন মনে করিবে যে গোশতের পানি এখন আর নাই। অতঃপর ইচ্ছামত গোশত গলাইয়া দেওয়ার নিয়ম এই যে, উক্ত গোশত ডুবিয়া যায়, এই পরিমাণ পানি উহাতে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে যেন গোশত ইচ্ছামত সিদ্ধ হইয়া গলিয়া যায়। অতঃপর জ্বাল দিতে দিতে পানি একেবারে শুকাইয়া ফেলিবে।

পানি শুষ্ক হইলে পর গোশত হইতে কোন ফেনা ও বুদ্ধবুদ্ধ হইবে বা এবং আবড় পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া গোশতের টুকরাগুলি পূর্বাপেক্ষা ছোট হইয়া যাইবে। কেননা, পূর্বে পানির গোশত ফুলিয়া বড় হইয়াছিল। যখন পানির অংশ একেবারেই থাকিবে না, তখন ১ নং নিয়মানুসারে গোশত ঘি হইতে ভিন্ন করিয়া, আরও এক ছটাক ঘি উহাতে ঢালিবে, সকল মসল্লা আধ-ভুনা করিয়া উহার মধ্যে গোশত ছাড়িয়া পানি ব্যতিরেকে পাকাইতে হইবে। নিয়ম মত পাক হইলে পর গরম মসল্লা দিয়া গরম গরম কোন একটি ঢাকনাদার পাত্রে ঢালিয়া তুলার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে, না হয় তুলা দ্বারা মোড়াইয়া ফেলিবে। উক্ত গোশত শীতকালে তিন দিন অন্তর একবার এবং গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ একবার খুব গরম করিতে থাকিবে এবং তুলার মধ্যে রাখিবে। ইহা প্রায় দুই মাসকাল স্থায়ী হইবে।

বিস্কুট পাউরুটি প্রস্তুত প্রণালী

সুজি অথবা ময়দার সহিত খামীর মিশ্রিত করিয়া ভালমত মছন করিয়া কোন কাঠের খণ্ডের উপর ফেলিয়া খুব কোটিতে হইবে। তারপর ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া তন্দুর গরম করিয়া ভিতরের আগুন ও কয়লা সরাইয়া দিয়া পাউরুটির ছাঁচগুলি তন্দুরের মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পাক হইয়া গেলে বাহির করিয়া লইবে। পূর্ণ বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

পাউরুটির খামীর প্রস্তুত করার নিয়ম—লবঙ্গ, এলাচী, জায়ফল, যাবিত্রী, ইন্দ্রযব, সমুদ্র ফেনা, তালমাখানা, পদ্মবীজ, প্রবালের শিকড়, নাগেরশ্বর গোলাব ফুল, দারুচিনি, কাঙ্ঘী-মূল, গোস্কুর ছোট-বড়, চোব চিনি ও কাবাব চিনি এই সকল দ্রব্য তিন তিন মাসা, জাফরান ছয় মাসা, লইয়া সব দ্রব্য কোটিয়া চালিয়া মজবুত কর্কের একটি শিশিতে রাখিয়া শিশির মুখটা শক্ত মত বন্ধ করিয়া রাখিবে। তাহা ছাড়া দেড় দেড় মাসা প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া খামীর বানানো যায়। ইহার কমে মসল্লা ঠিক হইবে না।

খামীর প্রস্তুত করিবার সময় প্রয়োজন মত এই উপাদানটি দেড় মাসা পরিমাণ লইয়া উহার সহিত সোয়া তোলা দধি মিশাইবে। তারপর উহার সহিত ময়দা মিশ্রিত করিয়া এই পরিমাণ শক্ত করিবে যেন কানের লতির মত হয়। এখন একটা টিলার মত করিয়া এক খণ্ড কাপড়ে সামান্য টিলা করিয়া বাঁধিয়া কোন উঁচুস্থানে তিন দিন পর্যন্ত লটকাইয়া রাখিবে। ৪র্থ দিনে উহা নামাইয়া দেখিবে যে, খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং টেলাটার উপর পাপড়ি পড়িয়াছে। পাপড়ি পরিষ্কার করিয়া উহার মধ্য হইতে আঠাল লেছদার খামীর বাহির করিবে। অতঃপর এক ছটাক দধির মধ্যে পূর্বের মত ময়দা মিশাইয়া কানের লতিবৎ শক্ত করিয়া ছানিবে। তারপর এই ছানা ময়দার সহিত উক্ত আঠাল খামীর মিশ্রিত করিয়া তামাক মাখার মত খুব মর্দন করিবে এবং টেলা পাকাইয়া কাপড়ে বাঁধিয়া ৬ ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিয়া অতঃপর উহা নামাইয়া খামীর বাহির করিয়া পুনরায় আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া পূর্বের মত কানের লতির ন্যায় শক্ত করিয়া ছানিবে এবং উহার সহিত এই খামীর মিশ্রিত করিয়া আবার কাপড়ে বাঁধিয়া ছয় ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিবে। তারপর আবার আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া গোলা বানাইয়া উহার সহিত খামীর মিশ্রিত করিয়া ছয় ঘন্টা লটকাইয়া রাখিয়া নামাইয়া খামীর বাহির করিবে এই চতুর্থবারে খামীর মাথা ময়দার গোল্লার উপর যে মামড়ি পড়িবে, উহা ছাড়ানোর দরকার নাই। অতঃপর আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া খামীরসহ খুব মথিবে। ভালমত মিশ্রিত হইয়া গেলে ৪ ঘন্টাকাল কোন পাত্রে উহা রাখিয়া দিবে। অতঃপর যদি খামীর রাখার ইচ্ছা হয়, তবে উহা হইতে অর্ধ ছটাক রাখিলেই হইবে। উপরি উক্ত নিয়ম মত অর্ধ ছটাক দধির সহিত ক্রমাগত খামীর বাড়াইতে থাকিবে। বর্ধিত খামীর হইতে অর্ধ ছটাক বাদ দিয়া যাহা থাকিবে উহার দুই গুণ পাউরুটি পাকাইবে। পুনরায় যদি দরকার হয়, তবে উক্ত রক্ষিত খামীরের সহিত খামীর বর্ধিত করিয়া খামীর বানাইবে। উক্ত হিসাবের সহিত তারতম্য করিয়া পরিমাণ বাড়ানো যায়।

আজকাল ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত নিয়মে খামীর এবং পাউরুটি প্রস্তুত করে না, তাহারা এসিড দ্বারা ময়দা ফুলাইয়া লয়, এই কারণে তাহা স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না।

পাউরুটি প্রস্তুত করার নিয়ম

পাউরুটি পাক করার জন্য উপরে যে খামীরের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধ সের ময়দার সহিত পানিসহ মছন করিবে, যখন ভালমত মথা হইবে তখন উহার উপর কাপড় দিয়া দুই ঘন্টা পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবে। যদি চার পাঁচ সের পরিমাণের পাউরুটি পাকানোর প্রয়োজন হয়, ততখানি ময়দাই খামীর মিশ্রিত করিয়া খুব মথিবে এবং সামান্য নিমক ও সাদাচিনি পরিমাণ মত মিশাইলে ভাল হয়। অতঃপর দেড় বা দুই ঘন্টাকাল রাখিয়া দিবে। এখন যেই ময়দা গুন্দা হইল উহা কানের লতিবৎ নরম করিবে, বেশী নরম হইলে নূতন লোকের পক্ষে রুটি বানান কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব, একটু শক্তই রাখা দরকার। বেশী শক্ত হইয়া গেলে একটু নরম করিয়া লইবে, আবার দুই ঘন্টা পর উক্ত গুন্দা ময়দাকে খুব মিথুন করিবে। যখন পূর্ণরূপে মথা হইয়া যাইবে এবং আঁশ ধরিবে তখন উহা কোন তক্তার উপর রাখিবে। তারপর যত বড় বড় রুটি বানাইতে হয় সেই পরিমাণের ময়দার গোল্লা বানাইবে। গুঁড়া ময়দা অথবা হাতে তৈল নিয়া গোল্লা বানাইয়া রাখিবে। যাহাতে হাতে না লাগে। এখন উহা রুটির সাঁজের মধ্যে রাখিবে। যখন এই গোল্লাগুলি আধা ফুলা হইয়া যাইবে তখন তন্দুর জ্বলাইবে। তন্দুরের উপরে একটা বাতি থাকিতে হইবে। পাউরুটির গোল্লাগুলি যখন ফুলিয়া পূর্ণ হইবে, তখন তন্দুরের আগুন বাহির করিয়া ফেলিবে এবং

একটি রুটির গোলা ভিতরে রাখিয়া দুই তিন মিনিট লক্ষ্য করিয়া দেখিবে; যদি ধরে, তবে মনে করিবে যে, তাপ ঠিক আছে। তারপর অন্যান্য গোলা বা চেলাগুলি তন্দুরের মধ্যে দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। আর যদি প্রথম রুটি দুই তিন মিনিট রাখিলে জ্বলিয়া যায়, তবে দশ পনের মিনিট অপেক্ষা করিয়া তন্দুর কিছু ঠাণ্ডা করিয়া তারপর অন্যান্য চেলাগুলি দিবে।

যদি তন্দুর বেশী ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তবে কিছু কয়লা তন্দুরের দরজার ভিতর দিকে রাখিয়া দিয়া দিবে; তবেই গরমের ভাগ পরিমাণ মত পাওয়া যাইবে। তিন চার মিনিট পর তন্দুরের ঢাকনা খুলিয়া বাতির আলোতে দেখিয়া নিবে এবং একটু লালচে রং ধরিলে তৎক্ষণাৎ রুটি বাহির করিয়া নিবে। একবার রুটি পাকাইয়া বাহির করিয়া নিলে যে তাপ তন্দুরের মধ্যে থাকে তাহাতে নান খাতায়ী এবং মিঠা বিস্কুট পাকান যায়। যদি নানখাতায়ী এবং মিঠা বিস্কুট কাঁচা তৈয়ার করা থাকে, তবে তন্দুর হইতে পাউরুটি বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা তন্দুরের ভিতর রাখিবে এবং মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলিয়া দেখিতে থাকিবে। পাক হইয়া গেলে বাহির করিয়া নিবে। আর যদি এখনও না খাতায়ী ও মিঠাবিস্কুট প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তবে তন্দুরের মধ্যে কয়লার আগুন রাখিয়া উহার ঢাকনা দিয়া তাপ রক্ষা করিয়া রাখিবে। এই তাপ পনের হইতে বিশ মিনিট পর্যন্ত রাখা চলে। তারপর আবার আগুন জ্বালাইতে হইবে। আগুন জ্বালানের পর যখন ভিতরের আগুন সরাইয়া ফেলিবে তখন উত্তপ্ত তন্দুরে কিছু নিমক ও দৈ মিশ্রিত পানি ছিটাইলে ভাল হয়।

যদি তন্দুর নূতন হয়, তবে প্রথমে তিন দিন পর্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া তন্দুর ঠিক করিয়া নিবে।

নানখাতায়ী প্রস্তুত করিবার নিয়ম

এক পোয়া ঘি, এক পোয়া সাদা চিনি, আধ আনা এলাচির দানা, তিন মাসা সমুদ্র ফেনা, গৈঁছর ময়দা পাঁচ ছটাক।

প্রথমে ঘি, চিনি, এলাচি বিশ মিনিট পর্যন্ত খুব মলিবে। ভালরূপে গলিয়া তরল হইয়া গেলে সমুদ্র ফেনা পিষিয়া উহার সহিত মিশাইবে এবং খুব ফেটিবে। অতঃপর এক পোয়া ময়দা মিশ্রিত করিবে। যদি একটু লেছকা থাকে, বাকী এক ছটাকও মিশাইয়া কানের লতির মত নরম করিয়া রুটি বানাইয়া তন্দুরে দিবে। যথাসময়ে পাক হইলে পর বাহির করিবে।

মিঠা বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম

দেড় পোয়া ঘৃত, আধ সের চিনি, ছয় মাসা সমুদ্র ফেনা, এক আনা পরিমাণ দুধ, চৌদ্দ ছটাক গৈঁছর ময়দা প্রথমে ঘি ও চিনি নানখাতায়ীর মত ফেটিবে এবং অল্প অল্প দুধ উহাতে ছাড়িতে থাকিবে। যখন সব দুধ মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন একবারে আধ পোয়া পানি উহাতে মিশাইবে এবং সমুদ্র ফেনাও পিষিয়া মিশাইবে। অতঃপর ময়দা মাখিয়া রুটির চেলা বানাইবে। যদি বেশী নরম হইয়া পড়ে, তবে আরো ময়দা মিশাইয়া বেলনা দ্বারা বেলিবার উপযুক্ত করিয়া রুটি বানাইয়া রুটি মত বিস্কুটের ছাঁচে কাটিয়া টিনের পাতে তন্দুরে দিবে। পাক হইলে পর বাহির করিয়া নিবে।

নিমকী বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম

এক পোয়া ঘৃত, এক-ছটাক চিনি, সোয়া আট মাসা নিমক, এক সের ময়দা ঘৃত, চিনি ও নিমক পিষিয়া একটা গামলায় রাখিয়া পাঁচ মিনিট পর্যন্ত খুব ফেটিবে তারপর ময়দা মিশ্রিত করিয়া খুব ফেটিবে। অতঃপর যতটুক বড় বড় বিস্কুট বানাইবার ইচ্ছা তত বড় করিয়া বেলিয়া বিস্কুটগুলি টিনের পাতের উপর রাখিবে এবং তন্দুরে দিয়া রাখিবে, পাক হইলে পর বাহির করিবে।

নিম্কী বিস্কুট পাউরুটি পাকাইবার পূর্বে পাকাইতে হয়। কারণ, ইহাতে তাপ কিছু বেশী প্রয়োজন হয়।

আমের আচার তৈয়ার করার নিয়ম

তাজা কচি আম, যাহার উপর কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই—এই প্রকারের আম লইয়া উহার উপরের ছিলকা এমনভাবে ছিলিয়া ফেলিবে যেন ভিতরে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর আমের নীচের দিক দিয়া ছিড়িয়া আমের আঁটি বাহির করিয়া ফেলিবে। আম যেন দুই খণ্ড না হইয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। অতঃপর রসুন, লাল মরিচ, সোঁপ, পুদিনা, আদা, কালি জিরা ও নিমক আন্দাজ মত মিশ্রিত করিয়া আমের মধ্যে ভরিয়া দিয়া ফাঁক করা স্থান সূতা দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া আট দশ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিবে। তারপর পুদিনার রসে বা সিরকার মধ্যে চুবাইয়া এক সপ্তাহ রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

যদি তৈলে দিয়া আচার বানাইতে ইচ্ছা হয়, তবে আর আম ছুলিতে হইবে না; বরং মসল্লাদি ও নিমক-ভরিয়া তৈলের মধ্যে ফেলিয়া রৌদ্রে দিলেই হইবে।

চাসনিদার আচার তৈয়ার করার নিয়ম

আধ সের কিস্মিস, আধ সের খেজুর (খুরমা) এক পোয়া আম চূর্ণ, আধ পোয়া আদা ও আধ পোয়া রসুন, এই সকল মসল্লা দ্রব্য তিন সের পুদিনা রসে ছাড়িয়া দেড় সের চিনি দিয়া ১৫ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

শালগমের আচার

পাঁচ সের পরিমাণ শালগমের টুকরা পানিতে সামান্য গরম করিয়া শুকাইয়া উহাতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি মিশ্রিত করিবে। আধ পোয়া নিমক, এক ছটাক লাল মরিচ, আধ পোয়া রাই সরিষা—এগুলি পিষিয়া লইবে, আধ পোয়া রসুন, এক পোয়া আদা ইহা পাতলা করিয়া কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া লইবে এই সকল দ্রব্য শালগমের সহিত মাখাইয়া দিবে। যখন ইহাতে ঝাঁজ ও টক সৃষ্টি হইয়া যাইবে, তখন সাদা চিনির শিরা অথবা গুড়ের শিরা তৈয়ার করিয়া উক্ত শালগমের টুকরাগুলিতে ঢালিবে। শিরা কমিতে থাকিলে আবার প্রস্তুত করিয়া দিতে থাকিবে। এই আচার বহুকাল স্থায়ী হয়।

নবরত্ন চাটনী তৈয়ার করার নিয়ম

কাঁচা ছোলা আম ১ সের, পুদিনার রস সোয়া সের বা সিরকা সোয়া সের, রসুন আধ ছটাক, লাল মরিচ আধ ছটাক, কালিজিরা ২ তোলা, সোঁপ ২ তোলা, শুষ্ক পুদিনা ২ তোলা, লবঙ্গ ৪ মাসা, জায়ফল ৪ মাসা, আদা ১ ছটাক, লবণ ১ ছটাক, চিনি বা গুড় ১ পোয়া। প্রথমতঃ সিরকার সহিত আম পিষিয়া নিবে অতঃপর সকল মসল্লা সিরকাসহ বাটিয়া আম বাটার সহিত মিশাইবে। এখন যে সিরকা বাকী রহিয়াছে অর্থাৎ আম বাটার ও মসল্লা পিষার পর যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার সহিত আরো আম এবং মসল্লা মিশাইয়া আগুনে জোশ দিবে, যখন ঘন হইয়া চাসনী তৈয়ার হইয়া যাইবে তখন ব্যবহার করিবে। যদি খোশ রং করিতে চাও, তবে দুই তোলা হলুদ বালু দ্বারা ভাজিয়া পিষিয়া উহার সহিত মিশাও। বাস্ নব রত্ন চাটনী তৈয়ার হইয়া গেল।

মোরব্বা প্রস্তুতের নিয়ম

কাঁচা আম এমনভাবে ছুলিবে যেন ভিতরের দিকে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর ভিতরের শাঁস বাহির করিয়া সুই অথবা কাঁটা দ্বারা খুব ফুড়িবে। ভাল মত ফোঁড়া হইয়া গেলে চুনের এবং

ফিটকারীর পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ২/৩ ঘন্টা পর পরিষ্কার পানিতে ভাল মত ধুইয়া বিশুদ্ধ পানিতে আধা সিদ্ধ করিবে। তারপর পানি হইতে উঠাইয়া নিংড়াইয়া আমগুলিকে বাতাসে শুকাইয়া নিবে।

অতঃপর কড়াইর মধ্যে আমের দ্বিগুণ চিনি অথবা পরিষ্কার গুড়ের শিরার মধ্যে ছাড়িয়া জোশ দিতে থাকিবে। শিরা যখন খুব গাঢ় আঁশ ধরিবে তখনই মোরক্বা তৈয়ার হইয়া গেল। এই নিয়মেই চাল কুমড়া, আমলকী ও ছেব ইত্যাদির মোরক্বা প্রস্তুত করিতে হয়।

নিমক পানির আম প্রস্তুত প্রণালী

গাছ হইতে পড়া অক্ষত পোখতা আম কুড়াইয়া আনিয়া ভাল মত ধুইয়া মাটির পাত্রে রাখিয়া আমের উপর পর্যন্ত পানি ভরিয়া দিয়া তিন দিন পর্যন্ত আমগুলি ডুবাইয়া রাখিবে। অতঃপর আমগুলি আবার ধুইয়া পানিগুলি ফেলিয়া দিবে। এইবার নূতন পানির মধ্যে প্রতি একশত আমের জন্য এক পোয়া নিমক, আধ পোয়া রসুন এবং আশু লাল মরিচ পরিমাণ মত দিয়া আমগুলি এই পানির মধ্যে ছাড়িয়া পনের দিন পর ব্যবহার করিবে। পানি সর্বদাই আমের উপর পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। কেহ কেহ দ্বিতীয়বারের পানি ফেলিয়া দিয়া তৃতীয় বারের পানির সহিত মেথি জোশ করিয়া পানি ঠাণ্ডা হইলে আমগুলির মুখে সামান্য তৈল মাখাইয়া দিয়া উক্ত পানির মধ্যে ছাড়িয়া থাকে। মেথির কারণে ঐ পানি নষ্ট হয় না বরং উহাতে আম বেশী দিন স্থায়ী হইয়া থাকে।

লেবুর আচার তৈয়ার করার নিয়ম

পাঁচ সের কাগজী লেবু পানির মধ্যে ফেলিয়া একদিন ভিজাইয়া রাখিবে। ২য় দিনে পানি ফেলিয়া দিয়া প্রতিটি লেবুর চার চার ফাড়া দিয়া উহার মধ্যে গরম মসল্লা, সৈন্দব লবণ ভরিয়া দিবে। পাঁচ সের লেবুর জন্য আধ সের মসল্লা এবং তিন পোয়া লবণই যথেষ্ট।

নিমক ও মসল্লা ভরিয়া লেবুগুলি একটি বর্তনে রাখিয়া উহার উপর অন্য লেবুর রস নিংড়াইয়া দিবে। কেহ কেহ লেবুর পানি ৩ বারও পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং সের প্রতি ১ ছটাক মসল্লা এবং গোড়া লেবুর রস যত বেশী নিংড়াইয়া দেওয়া যায়, ততই উহা বেশী দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

কেহ কেহ এই লেবুর আচারে ১৫ সের লেবুর জন্য ১ সের নিমক, ৬ মাসা শুষ্টি আদা, ৬ মাসা পিপুল, ৬ মাসা সমুদ্র ফেনা ও ৬ মাসা সাদা জিরা এই সকল দ্রব্য গরম মসল্লার সহিত চূর্ণ করিয়া দিয়া থাকে।

কাপড় রংগাইবার নিয়ম

কাল রং—পাথর চুনর গুঁড়া আধ সের, খাঁটি নীল এক সের, গুড়ের শিরা আধ সের, সকল বস্তু মিশাইয়া একটা চাড়া বা গামলার মধ্যে ভরিয়া সকালে, দুপুরে ও বৈকালে একটা কাঠি দিয়া খুব নাড়িয়া উহার গাদ উঠাইয়া ফেলিবে। যদি শীতকাল হয়, তবে উক্ত গামলার চতুর্দিকে আঙনের তাপ দিলে তাড়াতাড়ি গাদ উঠিয়া যাইবে। পরিষ্কার হওয়ার পর উহার মধ্যে কাপড় চোবাইয়া রং লাগাইবে। কাপড় শুকাইয়া তারপর তাজা কাঁচা দুধের মধ্যে ডুবাইবে অথবা মেন্দি পাতার পানি জোশ দিয়া তাহাতে কাপড় চুবাইয়া শুকাইয়া নিবে, উহাতে রং খুব পাকা হয়।

হলুদ রং

প্রথমে হলুদ খুব গুড়া করিয়া পানির মধ্যে মিশাইবে, উহাতে কাপড় রংগাইয়া নিংড়াইবে এবং শুকাইয়া নিয়া দুই তোলা সাদা ফিটকারী চূর্ণ করতঃ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই পানিতে

কাপড় ধুইয়া শুকাইবে। অতঃপর অর্ধ সের আমের ছাল তিন প্রহর পর্যন্ত পানির সহিত জোশ দিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে কাপড় চুবাইয়া রং করতঃ শুষ্ক করিবে।

সোনালী আভা রং

প্রথমে সিকি তোলা ওজনের হলদি দ্বারা রংগান পানিতে কাপড় রংগীন করিয়া এক পোয়া নাসপাল (ناسپال) পানিতে জোশ দিয়া উহা ছাঁকিয়া কাপড় রংগাইয়া অবশিষ্ট নাসপালের পানি রাখিয়া দিবে। তারপর সিকি তোলা ওজনের গেরু পানিতে মিশ্রিত করিয়া উহাতে পুনরায় উক্ত কাপড় রংগাইবে এবং পূর্বের যে রক্ষিত নাসপালের পানি আছে উহার মধ্যে কাপড় চুবাইয়া নিবে। অতঃপর একতোলা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার পানির সহিত মিশ্রিত করিবে। উহার মধ্যে উক্ত কাপড় একবার চুব দিয়া উঠাইবে। অবশিষ্ট ফিটকারীর পানির মধ্যে চাউলের গুঁড়া অথবা ময়দার সামান্য কলপ দিয়া কয়েক বার উক্ত কাপড় ডুবাইয়া উঠাইবে।

সোনালী রং করার অন্য নিয়ম

নাসপাল এবং মঞ্জিষ্ঠা সমপরিমাণ লইয়া আধ-থতো করিয়া অথবা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা বেলায় পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে উহা জোশ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। সর্বপ্রথম ফিটকারী খুব চূর্ণ করিয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া নিবে। অতঃপর নাসপাল এবং মঞ্জিষ্ঠার পানিতে কাপড় ডুবাইয়া রং করিয়া ফেলিবে।

গ্রীন বা সবুজ রং করার নিয়ম

ফিটকারীর পানির মধ্যে কাপড় ডুবাইয়া শুকাইয়া নিয়া তারপর নীলের পানির মধ্যে কাপড় ভিজাইবে। অতঃপর নাসপাল ও মঞ্জিষ্ঠার রসিন পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলেই সবুজ রং করা হইয়া যাইবে।

সবুজ বা গ্রীন রং করার ২য় প্রণালী

আধ পোয়া আমের কচি পাতা লইয়া আধ সের পানিতে জোশ দিবে, ছাঁকিয়া নিয়া উক্ত পানি রাখিয়া দিবে। অতঃপর অন্য পানিতে উহা ২য় বার জোশ দিতে হইবে এবং পানি পৃথক করিয়া রাখিয়া ৩য় বার জোশ দিবে এবং পানি ছাঁকিয়া পৃথক রাখিবে।

প্রথম বারের জোশ দেওয়া পানিতে কাপড় প্রথমে চুবাইয়া শুকাইয়া নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় বারের জোশ দেওয়া পানিতে চুবাইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর তৃতীয় বারের জোশ দেওয়া পানির সহিত নয় মাসা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে কাপড় খুব মলিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালী

বাবলার ছাল এক পোয়া, জায়ফল ৪ তোলা আধ কোটা করিয়া রাশ্রে পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ভোরে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। তারপর দুই তোলা ফিটকারী চূর্ণ ভিন্ন পানিতে মিশ্রিত করিয়া কাপড়খানা প্রথমে ফিটকারীর পানিতে ডুবাইবে। তারপর ছাল ভিজান পানির মধ্যে ভিজাইয়া উঠাইয়া এই রংগীন পানির মধ্যে হীরার কস এক তোলা পরিমাণ লইয়া মিশ্রিত করিয়া উক্ত কাপড় আবার চুবাইবে ও শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে।

লাল-আভা পাকা গাঢ় বেগুনী রং

আধ পোয়া মঞ্জিষ্ঠা এবং আধ পোয়া মেন্দি পাতা থতো করিয়া রাশ্রে ছয় সের পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে মাটির হাড়ীতে করিয়া কয়েকবার জোশ দিয়া ছাঁকিয়া রাখিবে।

অতঃপর বড় হরিতকী ও হলুদ চূর্ণ করিয়া বেশী পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া সমান ভাবে সমস্ত কাপড়টা রংগাইবে। লক্ষ্য রাখিবে যে ছাপ ছাপ রং না লাগে। অতঃপর কাপড় নিংড়াইয়া ছায়ার মধ্যে শুকাইয়া নিবে। অবশিষ্ট পানি রাখিয়া দিবে। তারপর আধ পোয়া গুড় ও আধ পোয়া শুকনা আমলকী একটা লোহার কড়াইতে লইয়া অল্প পানি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। যখন গরম হইয়া উহা হইতে বুবুদ উঠিবে এবং কাল রং ধারণ করিবে তখন পূর্বের রক্ষিত মঞ্জিষ্ঠা ও মেন্দী পাতার জোশ দেওয়া পানি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কাপড় রংগাইবে।

চকলেট রং

দুটি বড় বড় মাজু (এক প্রকার ঔষধ বিশেষ) আধ থেতো করিয়া এক প্রহর পর্যন্ত পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া বাটিয়া নিয়া কিছু বেশী পানির মধ্যে মিশ্রিত করিবে এবং উহার মধ্যে কাপড় রংগাইয়া শুকাইয়া নিবে। অতঃপর ঐ পানি ফেলিয়া দিয়া উক্ত পাত্রে নূতন পানি লইয়া উহার সহিত এক পেয়ালায় এক চতুর্থাংশ পরিমাণ “কাট” মিশ্রিত করিয়া উহাতে উক্ত কাপড় রংগাইবে।

“কাট” প্রস্তুতের নিয়মঃ পনের সের পানির মধ্যে দুই সের লোহা, কিছু আমলকী, কিছু বড় হরিতকী মিশাইয়া অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল রাখিবে। কেহ কেহ সেমাই জ্বাল দিয়া উহার পানিও মিশ্রিত করিয়া থাকে। যদি রংকারকদের নিকট কাট পাওয়া যায়, তবে আর নিজে প্রস্তুত করার দরকার নাই।

বাদামী বা হাল্কা জরদ রং

প্রথমে হাল্কা রংগের গেরু দ্বারা কাপড় রং করতঃ শুকাইয়া নিবে। অতঃপর “তুল” (এক প্রকার গাছের গোটা) হামান দিস্তায় কুটিয়া উহার শাঁস বাহির করিয়া লইবে। শাঁসগুলি পানির সহিত ২/৩ বার জোশ দিয়া অপর একটি পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা পানি লইয়া জোশ দেওয়া পানির অর্ধেক মিশ্রিত করিবে এবং কাপড় চুবাইয়া দেখিবে যদি রং একটু কম গাঢ় মনে হয়, তবে বাকী অর্ধেক জোশ দেওয়া তুলের পানিও উক্ত ঠাণ্ডা পানির সহিত মিশাইয়া কাপড়ে দিবে।

(পাকা বেগুনী রং যাহা একটু কালচে লাল বর্ণের হয় উহাকে ইংরেজীতে ব্রাউন রং বলে) চূনের পানির সহিত পতঙ্গ শিরীন জোশ করিয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত বড় হরিতকী এবং হীরার কস পিষিয়া মিশ্রিত করিয়া থাকে। (হীরা কস এক প্রকার ফিটকারী বা লৌহ ও গন্ধক মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।)

লাল পাকা রং

তিন ছটাক পতঙ্গ শিরীন কুচা কুচা করিয়া কাটিয়া এক সের পানিতে জোশ করিয়া এক রাত্র রাখিয়া পরের দিন সকালে পুনরায় জোশ দিয়া আধসের পানিতে নামাইয়া উহা ছাঁকিয়া পানি পৃথক করিয়া রাখিবে এবং উক্ত পতঙ্গ শিরীনের ছাঁকা অংশ পুনরায় ততখানি পানিতে জোশ দিয়া অর্ধেক থাকিতে ছাঁকিয়া সেই পানিও পৃথক রাখিবে। প্রথমে এক তোলা বড় হরিতকী পিষিয়া পানি মিশ্রিত করতঃ উহাতে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর দুইবার জোশ দেওয়া ১ম বারের পতঙ্গ শিরীনের পানিতে কাপড় রংগাইবে এবং কাপড় শুকাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় বারের একবার জোশ দেওয়া পানিতে এক তোলা সাদা ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া হাত দ্বারা খুব নাড়িবে যেন উহার ফেনা উঠিয়া যায়। অতঃপর উক্ত কাপড় এই পানির মধ্যে এক প্রহর পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। রং করা হইয়া গেলে চিপিয়া শুকাইয়া লইবে।

পেস্তা রং

কাপড়ে প্রথমে হলুদ রং দিয়া সাবানের পানিতে ভিজাইবে। অতঃপর কাগজী লেবুর রস পানিতে মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইবে।

পেস্তা রংয়ের দ্বিতীয় নিয়ম

৪ মাসা নীল চূর্ণ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহার মধ্যে কাপড়ে রং লাগাইয়া শুকাইয়া ফেলিবে। অতঃপর ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া শুকাইবে এবং ৪ তোলা নাসপাল পানির মধ্যে কাপড় চুবাইয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবে।

নীল রং

প্রথমত নীল তুঁইতা পিষিয়া পানিতে মিশাইয়া রাখিবে। তারপর চুনা পাথর দ্বারা কাপড়ের হাল্কা রং দিবে। অতঃপর উক্ত তুঁইতা মিশ্রিত রং পৃথকভাবে লইয়া উহাতে কাপড় চুবাইতে থাকিবে এবং প্রত্যেক বারেই শুকাইতে থাকিবে। যখন কাপড়টি মনোরম রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যাইবে তখন ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া অতঃপর চিপিয়া শুকাইবে।

খাদ্য অধ্যায়

বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ জানা না থাকিলে শরীর রক্ষা করা দুষ্কর। সে জন্য এই অধ্যায়ে খাদ্যের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

খাদ্যের দ্বারা আমাদের দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়। শরীর রক্ষার জন্য কোন্ জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে আহর করিলে শরীরে যথোচিত শক্তি ও তাপ উৎপন্ন হয় তাহা জানা দরকার। খাদ্য হইতে যে পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহার $\frac{2}{3}$ অংশ কর্ম শক্তিতে এবং অবশিষ্ট $\frac{1}{3}$ অংশ দেহের তাপ বজায় রাখিতে ব্যয়িত হয়।

শ্বেতসার ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যই শরীরের তাপ উৎপাদন করে। এজন্য বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে $\frac{1}{3}$ ভাগ শ্বেতসার ও স্নেহ পদার্থ এবং এক ভাগ আমিষ জাতীয় পদার্থের আবশ্যিক। ঘৃত, মাখন প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের মূল্য বেশী। এগুলি অধিক খাইলে শরীরে মেদ জন্মে বলিয়া দুনিয়ার সকল দেশেই দেহের তাপের সমতা রক্ষার জন্য ভাত, রুটি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(১) আমিষ জাতীয় খাদ্য—মাছ, গোশত, ডিম, ছানা প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন ডাল, দুধ, আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতিতেও অল্পাধিক আমিষ জাতীয় উপাদান আছে।

(২) স্নেহ পদার্থ—ঘৃত, মাখন, তৈল ইত্যাদি। ইহাছাড়া দুধ, নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, মাছ, গোশত, প্রভৃতিতেও কিছু পরিমাণে স্নেহ পদার্থ আছে।

(৩) শ্বেতসার—ভাত, রুটি, পাউরুটি, সুজি, আলু, চিনি, গুড় ইত্যাদি।

(৪) লবণ জাতীয়—লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস, ধাতব লবণ।

(৫) পানি; (৬) ভিটামিন। এই ছয় প্রকারের পদার্থই প্রত্যেক লোকের দেহের শক্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন।

আমাদের খাদ্যে উপরোক্ত সকল প্রকারের উপাদানই যথোচিত পরিমাণে থাকা আবশ্যিক। কোন এক জাতীয় খাদ্যে সকল জাতীয় উপাদান থাকে না। বিভিন্ন উপাদানের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন।

আমিষ জাতীয় উপাদান শরীরের ক্ষয়পূরণ করে। স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় উপাদান তাপ ও কর্ম শক্তি উৎপাদন করে। লবণ জাতীয় উপাদানে অস্থির গঠনও বৃদ্ধি করে।

পানি দেহে রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা করে এবং ভিটামিন জীবনী শক্তি বর্ধন করে। শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই সবগুলিই অপরিহার্য। এইজন্য আমাদের সুস্বাদু খাদ্য খাওয়া উচিত। যে খাদ্যে উক্ত ছয় প্রকারের উপাদান থাকে এবং দেহ পরিপূরক, দেহ পরিপোষক এবং দেহ সংরক্ষক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং আহার করিলে সহজেই হজম হইয়া যায়, দেহের দৈনিক ক্ষয়পূরণ ও দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপাদন হয়। এরূপ খাদ্যকেই সুস্বাদু খাদ্য বা মিশ্র খাদ্য বলে।

খাদ্য গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে শরীরের ক্ষয় পূরণ করা। মাছ, মাংস, ছানা, ডিম প্রভৃতি প্রাণীজ আমিষ উদ্ভিজ্জ আমিষ অপেক্ষা শরীরের ক্ষয় পূরণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এইজন্য পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় আমিষের এক তৃতীয়াংশ প্রাণীজ আমিষ হওয়া উচিত। আটার আমিষ অপেক্ষা চাউলের আমিষ দেহের ক্ষয় পূরণের পক্ষে বেশী উপযোগী। অথচ আটার আমিষ চাউলের আমিষের প্রায় দ্বিগুণ। এইজন্য শুধু ভাত বা শুধু রুটি না খাইয়া এক বেলা ভাত এবং এক বেলা রুটি খাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক হিতকর।

ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ

আমাদের খাদ্যে আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, লবণ ও পানি এই পাঁচ প্রকার উপাদান ব্যতীত এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, যাহার অভাবে আমাদের দেহের যথাযথ পরিপোষণ হয় না এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই ভিটামিনগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম এবং পরিমাণে সামান্য হইলেও আমাদের দেহের উপর ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। জীবন ধারণের পক্ষে এই সামান্য সূক্ষ্ম অপরিহার্য পদার্থগুলির নামই হইল ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। এই ভিটামিন মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলী, যকৃত ও পাকস্থলী প্রভৃতি অন্তরীণ যন্ত্রগুলির ক্রিয়ার সহায়তা করে। ইহাদের অভাবে দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি হ্রাস পাইয়া নানা প্রকার কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন রোগ জন্মে। ভিটামিন প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। ইহারা বিভিন্নভাবে থাকে এবং ইহাদের কার্য ও গুণ বিভিন্ন। কোন কোন খাদ্যে একাধিক ভিটামিনের সমবায়ও দেখা যায়।

**স্বাস্থ্যের উপর ভিটামিনের প্রভাব ও
ভিটামিনের উপকারিতার তালিকা**

কিসে কিসে পাওয়া যায়	উপকারিতা	অভাবে অপকারিতা
<p>A</p> <p>ভিটামিন A দুধ, মাখন, দুধের সর, ডিম, কডলিভার অয়েল, টাটকা শাক-সবজি, লাল ও হলুদ ফল, পশুর যকৃত, পালংশাক, মিষ্টি আলু ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।</p>	<p>ভিটামিন দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করে, রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়ায়, দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে।</p>	<p>ইহার অভাবে রাতকানা ও নানা প্রকার চক্ষু রোগ জন্মে। চর্ম রোগও হইতে পারে।</p>
<p>B</p> <p>টেকি ছাঁটা চাউল, যঁতায় ভাজা আটা, ডাইল, বাদাম অংকুরিত শস্য, মাছ, পশুর যকৃত, ডিম, আলু, কলা, পুঁইশাক, ফেন না-গালা ভাত প্রভৃতি।</p>	<p>স্বাস্থ্য রক্ষা করে, স্নায়ুর পুষ্টি বৃদ্ধি পায়, কার্য ক্ষমতা ও সাহস বৃদ্ধি করে, শিশুদের বৃদ্ধি বজায় রাখে।</p>	<p>বেরী বেরী রোগ হয়, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়।</p>
<p>C</p> <p>অংকুরিত শস্য, লেবু, আনারস, আম, টমাটো, বেগুন, টাটকা শাক-সবজি গুড়, মাছের ডিম, বাঁধাকপি, গোলাপ জাম প্রভৃতি।</p>	<p>রক্ত ও দেহের রসগুলিকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিষেধক, শক্তি বাড়ায়।</p>	<p>স্কার্ভি রোগ জন্মায়। চর্ম রোগ দেখা দেয়। দাঁতের মাড়ী নষ্ট হয়। অকালে দাঁত পড়িয়া যায়।</p>
<p>D</p> <p>ডিম, দুধ, মাখন, মাছের তৈল, পশুর যকৃত, ছোট মাছ, কাঁচা শাক-সবজি, বাঁধাকপি, ডাটা ইত্যাদি এবং সূর্য কিরণ।</p>	<p>অস্থি, দন্ত ও পেশী গঠনের সাহায্য করে।</p>	<p>অস্থি দুর্বল হয় ও রিকেট রোগ জন্মে।</p>
<p>E</p> <p>কডলিভার তৈল, টেকি ছাঁটা কুড়ায়ুক্ত চাউল, গম ও যব, বাদাম, ডিমের কুসুম।</p>	<p>মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে।</p>	<p>প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়। সহবাসে অক্ষম হয়। যৌনশক্তি লোপ পায়।</p>

কোন খাদ্যে কত গুণ ভিটামিন আছে
তাহার তালিকা

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন
	A	B	C	D	E
টেকি ছাঁটা চাউল	+	++	-	+	+
কলে ছাঁটা চাউল	o	o	-	-	o
গম	+	++	-	-	+
কলে পিষা ময়দা	o	+	-	-	-
যাঁতায় ভাঙ্গা আটা	+	++	-	-	+
সাদা ধবধবে পাউরুটি	o	o	o	-	-
যাঁতায় ভাঙ্গা আটার পাউরুটি	+	++	-	-	-
যব	+	++	-	-	+
অংকুরিত ছোলা, মটর, মুগ	+	++	++	-	-
গমের ভূষি	+	++	-	-	-
চাউলের কুড়া	+	++	-	-	+
মুসুরী ডাল	+	++	-	-	-
চিনি	o	o	o	-	-
গুঁড়	o	+	-	-	-
মধু	o	+	o	-	-
কাঁচা দুধ	+++	++	+	+	+
বেশী জ্বাল দেওয়া দুধ	+	+	-	-	-
কণ্ডেন্স মিল্ক বা কোটায় ভরা ঘন মিঠা দুধ	+	+	-	-	-
পনির	++	?	-	-	-
ননী	+++	++	+	-	-
দধি বা যোল	+	+++	+	-	-
মাখন	+++	-	o	-	-
ঘৃত	+++	+	-	-	+
কাঁচা গোশ্ত	+	+	+	-	-
সিদ্ধ গোশ্ত	+	+	+	-	-
মগজ বা মস্তিষ্ক	+	++	-	-	-
হৃৎপিণ্ড	+	+++	-	-	-
কলিজা বা যকৃত	++	++	-	-	+
মৎস্য	++	++	-	-	-

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন	ভিটামিন
	A	B	C	D	E
মাছের যকৃত	++	-	-	-	-
মাছের ডিম	+	++			
গরুর চর্বি	++	০	০	-	-
কডু লিভার ওয়েল	++++	?	০	+++	-
ডিম	++	+++	০	-	-
ডিমের কুসুম	++	+	?	+	+
ডিমের সাদা অংশ	?	?	?	-	-
বাদাম তৈল	০	০	০	০	+
কাবুলী বাদাম	০	০	০	০	+
চিনা বাদামের তৈল	++	০	০	-	-
সরিষার তৈল	০	০	০	০	-
চিনা বাদাম	+	++	-	-	-
বুনা নারিকেল	+	++	০	-	-
নারিকেলের দুধ	-	++	-	-	-
আখরোট	+	++	-	-	-
আপেল	+	+	+	-	-
বেদানা		+	+	-	-
কলা	+?	+	+	-	-
আনারস	-	++	++	-	-
আঙ্গুর	০	++	++	-	-
সর্বপ্রকার লেবু	-	+	+	-	-
লিচু	-	+	++	-	-
আম	+	-	++	-	-
পেয়ারা	০	+	+	-	-
তেঁতুল	?	+	+	-	-
টমাটো	+	+++	+++	-	-
কিসমিস	-	+	+	০	০
খুরমা	-	+	-	-	-
বরবটি (কাঁচা)	-	+++	-	-	-
বাঁধাকপি (কাঁচা)	+	+++	+++	-	-
বাঁধাকপি (সিদ্ধ)	+	++	++	-	-
ফুলকপি	+	++	+	-	-
গাজর	++	++	++	+	-
ঢেরস	-	+	+	-	-

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন A	ভিটামিন B	ভিটামিন C	ভিটামিন D	ভিটামিন E
ওলকপি	-	+	+	-	-
লেটুস শাক	++	++	+++	-	-
পটল	-	+	+	-	-
গোল আলু (কাঁচা)	+	++	++	-	-
গোল আলু (সিদ্ধ)	?	++	++	-	-
লাল মিঠা আলু	++	+	?	-	-
কলাই সুঁটি	++	++	+?	-	-
পালং শাক	+++	+++	+++	+	-
ইক্ষু	-	+	+	-	-
মুলা	?	+	?	-	-
শালগম	?	+	++	?	-
পেঁয়াজ	?	+	?	-	-
রসুন	?	?	++	-	-
বেগুন	?	+	+	-	+
তিল তৈল	?	0	0	-	-

যদিও তৈলে কোন প্রকার খাদ্যপ্রাণ নাই, তবু দেহের তাপ রক্ষার্থে উদ্ভিজ্জ তৈল খাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর সি, আই, ই; আই, এস ও এম বি, এফ,সি, এস রসায়নাচার্য প্রণীত খাদ্য নামক পুস্তক হইতে উপরিউক্ত খাদ্যপ্রাণ তথ্যাদি সংগৃহীত হইল।

ভিটামিন A—ইহা দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বর্ধন করে, দন্তদিগকে সাহায্য করে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহার অভাবে শিশু বালক-বালিকাদের শরীর রীতিমত বৃদ্ধি পায় না।

এই ভিটামিন সাধারণ উত্তাপে নষ্ট হয় না, কিন্তু রন্ধনকালে বেশী উত্তাপে বাষ্পের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য রন্ধনকালে খাদ্য-দ্রব্য ঢাকনা দিয়া অল্প উত্তাপে পাকান উচিত। বেশী সিদ্ধ করা দ্রব্যে খাদ্যপ্রাণ থাকে না। এই জন্য যাহাতে বাষ্পের সহিত খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। তরকারীর বাকলে, চাউলের কুড়ায় বেশী ভিটামিন থাকে, এই জন্য চাউলের কুড়া ছাড়ান ঠিক নহে। তরকারী খোসাসহ যতদূর সম্ভব খাওয়া উচিত। ভাতের মাড় কোনমতেই ফেলান উচিত নহে। মাড় না গালিয়া রন্ধন করাই উত্তম। যদি মাড় গালিতেই হয়, তবে খাওয়ার সময় ভাতের সহিত ফেনও খাইবে। তরকারীর মধ্যে কিছু চাউলের কুড়া মিশ্রিত করিয়া রাখিলে বিশেষ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

ভিটামিন B—ইহা শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য করে। পেশী, স্নায়ুমণ্ডলী, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলীকে সবল করে। দেহ যন্ত্রগুলিকে কর্মক্ষম রাখে। বেরিবেরি, স্নায়ু প্রদাহ প্রভৃতি রোগ দূর করার সহায়তা করে।

ভিটামিন B দুই প্রকারঃ B-১নং এবং B-২নং উভয়ের গুণই প্রায় সমান। এইজন্য ইহাকে ভিটামিন (B Complex) মিশ্রিত-বি ভিটামিন বলে। ভিটামিন B-১নং কে বেরিবেরি প্রতিরোধক ভিটামিন বলে। ইহাও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, স্নায়ুমণ্ডলীকে সবল ও কর্মক্ষম রাখে, হজম শক্তি বাড়ায়। ভিটামিন B-২নং শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যথা, পালং শাক, কলমী শাক, লেটুস শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি। সমস্ত তরিতকারীর খোসায়, মটর, মসুর, ছোলা ইত্যাদির ভূষিতে চাউলের কুড়ায়, বিশেষ করিয়া রোদের তাপ প্রাপ্ত গাছ-গাছড়ার ফল ও তরিতকারীতে প্রাপ্তব্য। এইজন্য খোসায়ুক্ত তরকারী, ডাল, ইত্যাদি মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত।

ভিটামিন C—ইহা রক্ত ও দেহরসগুলিকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন D—ইহা অস্থি, দন্ত ও পেশী গঠনে সাহায্য করে। এইজন্য ছোট শিশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডিয়ুক্ত খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত। ভোরের রৌদ্রের তাপের মধ্যে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, ইহাকে অণ্টাভায়েলেটও বলে। এইজন্য শিশুর শরীরে দৈনিক কিছু সময় সকাল বেলায় রৌদ্রের তাপ দেওয়া উচিত। ইহাতে শিশুরা সর্দি, কাশি ও চর্মরোগ হইতে মুক্ত থাকে। শরীর মজবুত হয়, রোগ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন E—এই ভিটামিন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে, প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে, রতিশক্তি বর্ধন করে, যৌবন শক্তি স্থায়ী রাখে। এই ভিটামিনের অধিকাংশ চাউলের কুড়ায়, ভাতের ফেনে, ডিমের কুসুমে, কডলিভার অয়েলে, গম-যব, পশুর কলিজায় ও কাবুলী বাদামে পাওয়া যায়।

একজন পরিশ্রমী পূর্ণ বয়স্ক বাঙ্গালী লোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য-তালিকা (দুই বেলায়) :

খাদ্য	পরিমাণ
চাউল	৪ ছটাক
আটা	৩ ছটাক
ডাইল	২ ছটাক
ঘৃত, মাখন, তৈল	১½ ছটাক
মাছ, গোশত, ডিম ও ছানা	২ ছটাক
শাক-সবজি ও ফল	৩ ছটাক
দুধ	৪ ছটাক
গুড় বা চিনি	½ ছটাক
নিমক	পরিমাণ মত
পানি	প্রচুর পরিমাণে

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীর হইতে মলমূত্র, ঘাম ইত্যাদির সহিত দৈনিক প্রায় সাড়ে তিন সের পানি সরিয়া যায়। ইহা পূরণের জন্য এবং পাকস্থলীর ক্রিয়া রক্ষার ও ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রচুর পানি পান করিবে। পানিতে পাকস্থলী দৌত হইয়া যায়। অতএব, সর্বদা বিশুদ্ধ পানি পান করিবে, বিশেষ করিয়া রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে এবং ভোরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানি পান করা কর্তব্য, ইহাতে অনেক উপকারিতা আছে।

শাক—প্রায় সমস্ত শাকই গুরুপাক, অতিশয় মলজনক ও মলবাত নিঃসারক। শাক শরীর ও অস্থি নাশ করে, দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, রক্ত, শুক্র নষ্ট করে, অকালে বার্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীর বিনাশের হেতু। অল্পেও প্রায় এই সকল দোষ বর্তমান থাকে। অতএব, শাক বেশী ভক্ষণ করা উচিত নহে। যে সকল শাকে $\frac{1}{3}$ উপকারিতা আছে, তাহা খাওয়ার উপকার বৈ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অতিরিক্ত শাক ভোজনে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক।

বেতো শাক—ইহা হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, রুচিপ্রদ, শুক্র ও বলকারক সারক এবং প্লীহা, রক্ত-পিত্ত, অর্শ, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক।

গীমা শাক—লঘু পাক, রুচিকারক এবং পিত্ত, কফ, কামলা পাণ্ডু জ্বর ও প্লীহা রোগ নাশ করে।

শেচি বা শালিঞ্চ শাক—ইহা অগ্নি বর্ধক, কফবাত প্রশমক, প্লীহা ও অর্শরোগ নাশক।

পুঁই শাক—ইহা ঠাণ্ডা, শ্লেষ্মাকর, কঠোর অহিতকর, নিদ্রাজনক, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্র বর্ধক, রক্তপিত্ত নিবারক, বলকারক, রুচিপ্রদ, সুপথ্য পুষ্টিকারক তৃপ্তিজনক।

পুদিনা—অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা বা তোতলামী নাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর এবং বমি ও অরুচি নিবারক।

কাঁটা নটে শাক—ইহা লঘু পাক, ঠাণ্ডা, রুচিকর, মল-মূত্র সংশোধন করে, পেটের অগ্নি বাড়ায় এবং পিত্ত, কফ, রক্ত দৃষ্টি ও বিষ নাশক।

পালং শাক—ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, কফ বাড়ায়, পায়খানা বাড়ায়, পেট নরম করে, গুরুপাক, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ দূর করে।

পাট শাক—ইহা রক্তপিত্ত দোষ দূর করে, মল বর্ধক, বাতের প্রকোপ বাড়ায়।

কলমী শাক—স্তন দুগ্ধ বাড়ায়, শুক্র বৃদ্ধি করে, চোখের জ্যোতির হিতকর ও ঠাণ্ডা। বিষ দোষ নষ্ট করে।

নুনে শাক বা নোনতা শাক—ইহা গুরুপাক, হজম শক্তি বাড়ায়, অর্শ রোগ, বায়ু শ্লেষ্মা, অগ্নি-মান্দ্য ও বিষ দোষ দূর করে।

হেলেঞ্চ বা হিঞ্চে শাক—ইহাকে ব্রহ্মী শাকও বলা হয়। ইহা শোষ কুষ্ঠ কফ ও পিত্ত দোষ নিবারণ করে।

মূলা শাক—মূলার কচি শাক হজমী কারক, লঘু, রুচিকর ও গরম। ইহা তৈল ঘৃতের সহিত পাকাইয়া ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিত্ত কফ নিবারক হয়। আর সিদ্ধ না হইলে কফ ও পিত্ত বাড়াইয়া দেয়।

মটর শাক—লঘু পাক, পেট নরম করে, বায়ু, পিত্ত, কফ দোষ দূর করে।

সরিষার শাক—মল-মূত্র বাড়ায়, গুরুপাক, দাহ বাড়ায়, গরম, বায়ু পিত্ত, কফ বাড়াইয়া দেয়। ইহা সমস্ত শাকের নিকৃষ্ট শাক।

ছোলা শাক—রুচিকর, হজম হওয়া কঠিন, কফ, বাত বৃদ্ধি করে, মল বৃদ্ধি করে ও দাঁতের ফোলা দোষ দূর করে।

পটল শাক—ইহা পিত্ত দোষ নষ্ট করে, হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, ঠাণ্ডা, লঘুপাক, শুক্র বর্ধক, জ্বর, কাশ ও ক্রিমি রোগ নিবারক।

গন্ধ ভাছুলে—গুরুপাক, শুক্র বর্ধক, বল কারক, ভগ্ন সংযোজক, সারক, বাত, রক্ত ও কফ দূর করে।

কলাই শাক বা খেসারী শাক—গুরুপাক, মুখ রোচক। আর কোন গুণ নাই।

খুলকুড়ি, ঠানকুনি বা ঢাকা পাতা—ইহা ঠাণ্ডা, সারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, স্বর বর্ধক ও স্মৃতি বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্ত দোষ, কাশ, বিষদোষ, শোষ ও জ্বর নাশক।

কলার মোচা—ঠাণ্ডা, দেরিতে হজম হয়। বায়ু পিত্ত ও ক্ষয় নিবারণ করে।

শজিনার ফুল ও ডাটা—তেজস্বী, ফুলা নিবারক, ক্রিমি, কফ, বায়ু, স্নীহা ও গুল্ম নিবারক।

বেতের ডগা—ভেদক, লঘু, ঠাণ্ডা, বাত বর্ধক এবং রক্ত দোষ, কফ ও পিত্তের দোষ দূর করে।

ধনে শাক—পিত্ত নাশক, রুচিকর, তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস-কাশ ও ক্রিমি নিবারক।

পান—রুচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কাম দীপক। ইহা কফ, মুখ দুর্গন্ধ, বায়ু শ্রান্তি ও রাত্রন্ধতা (রাত কানা) নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রুচি বর্ধক, অগ্নি দীপক, পাচক ও কফবাত নাশক।

তরি-তরকারি

কদু—ইহা শক্তি বর্ধক, শরীর মোটা-তাজাকারক, রুচিকর, ধাতু বর্ধক পুষ্টিকর ও পিত্ত শ্লেষ্মা নষ্ট করে। ইহা পেটে থাকা অবস্থায় কলেরা রোগ হয় না।

চাল কুমড়া—পুষ্টিকারক, রস বর্ধক, দেরীতে হজম হয় এবং রক্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক।

কচি কুমড়া—হজম শক্তি বাড়ায়, তাড়াতাড়ি হজম হয়, পাকস্থলী শোধক, চিত্ত বিকৃতি বা উন্মাদ দোষ এবং সর্বদোষ প্রশমক।

মধ্যম কুমড়া—বলকারক।

চিচিঙ্গে বা কহী—ইহা বাত পিত্ত নাশক, বলকারক, পথ্য ও রুচিপ্রদ। ইহা শোষ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। পটলেরও এই গুণ; কিন্তু চিচিঙ্গের গুণ পটল হইতে কিছু কম।

বিঙ্গে—কফ, পিত্ত নাশক, ক্ষুধা, রুচি, বল ও বীর্য বাড়ায়।

পটল—ইহা কাশ, রক্ত দোষ, জ্বর, ক্রিমি ও বায়ু পিত্ত কফ দূর করে।

শিম—ইহা সহজে হজম হয় না, পেট গরম করে, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মা বাড়ায় ও বাত পিত্ত দূর করে।

সজিনার ডাটা—অত্যন্ত অগ্নি বর্ধক, কফ, পিত্তশূল, কুষ্ঠ, ক্ষয় শ্বাস ও গুল্ম রোগ বিনাশ করে।

করলা ও উচ্ছে—ইহা ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, সহজে হজম হয়, জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি দূর করে। ইহা বাত বৃদ্ধি করে না। উচ্ছের গুণ করলার ন্যায়। বিশেষতঃ ইহা সহজে হজম হয় এবং পেটের অগ্নি বৃদ্ধি করে।

ধুঁধুল—ঠাণ্ডা, রক্ত পিত্ত ও বায়ু নাশক।

বেগুন—পিত্তকর নহে, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, লঘু পাক। ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মা বিনাশক। কচি বেগুন কফ ও পিত্ত নাশক। পাকা বেগুন পিত্তকারক ও গুরুপাক। পোড়া বেগুন অত্যন্ত

লঘু, সামান্য পিত্তকারক, হজমশক্তি বাড়ায়, কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষের শাস্তি কারক। পোড়া বেগুন লবণ ও তৈলে মিশ্রিত করিলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। আর এক প্রকার ডিমের মত সাদা বেগুন আছে, তাহা পূর্বোক্ত বেগুন হইতে নিরস কিন্তু অর্শ রোগে বড় উপকারী।

টেঁড়শ—রুচিকর, মল বৃদ্ধি করে, পিত্ত শ্লেষ্মা দূর করে। ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, প্রস্রাব বাড়ায়, পাথরী রোগ উপশম করে।

কাকরোল—পায়খানা পরিষ্কার করে। কুষ্ঠ, হক্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাশ ও জ্বর সারায়। ইহা অগ্নিদীপক।

ওলকচু—ইহা পাকস্থলীর অগ্নি বাড়ায়, কফ, কাশি, অর্শ, প্লীহা ও গুল্ম বিনাশক। বিশেষতঃ অর্শ রোগে সুপথ্য। কিন্তু দাদ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠ রোগীর জন্য ইহা হিতকর নহে।

মান কচু—ইহা ফুলা নিবারক, ঠাণ্ডা, লঘু এবং পিত্ত রক্তের দোষ দূর করে।

গোল আলু—দুস্পাচ্য, মল বর্ধক, গুরুপাক, মল-মূত্র নিঃসারক, রক্তপিত্ত দোষ নাশক, বলকারক, শুক্র বর্ধক, স্তন্য বর্ধক।

মিঠা সাদা আলু—ইহা প্রস্রাবের পীড়া দূর করে, দাহ, শোষ, প্রমেহ রোগ দূর করে। গুরুপাক, মূত্রকৃচ্ছ রোগীর পক্ষে সাদা মিঠা আলু বিশেষ উপকারী।

লাল মিঠা আলু—বলকর, গুরুপাক ঠাণ্ডা, কফ দোষ দূর করে, পায়খানা বাড়ায়, তৈলে ভাজিলে খুব রুচিকর হয়।

মূলা—রুচিকর, লঘু, পরিপাক সহজ, ত্রিদোষ নাশক, গলার আওয়াজ পরিষ্কারক, ইহা জ্বর, শ্বাস, নাকের ভিতরের রোগ, গলার ভিতরের রোগ, চক্ষুর রোগ দূরীভূত করে। বড় মূলা তৈলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষ নাশক হয়।

গাঁজর—হজমশক্তি বাড়ায়, সহজে হজম হয়, মল সংগ্রহ করে, রক্তপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী, কফ ও বায়ু বিনাশ করে।

কাঁচা কলা—ইহা দেহীতে হজম হয়, ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, রক্ত, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় নিবারণ করে এবং বায়ু দূর করে।

পাকা কলা—শুক্র বৃদ্ধি করে, পুষ্টিজনক, রুচিকারক, মাংস বর্ধক, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারক, প্রমেহ নাশক, চক্ষুর হিতকারী।

কলার থোড় বা ভাঁড়ালী—(কলা গাছের মধ্যের দণ্ডের নাম) ইহা অগ্নি বর্ধক, যোনিদোষ দূর করে, রক্তপিত্ত দোষ বিনাশ করে।

দেশী ফল-ফলাদির গুণাগুণ

যজ্ঞ ডুমুর—পিত্ত, কফ ও রক্তের দোষ দূর করে।

পেঁপে—ঠাণ্ডা, রুচিকর, হজমীকারক, সহজপাচ্য, সারক ও রক্ত-পিত্ত নাশক, ইহা অর্শ রোগের বিশেষ উপকারী। পেঁপের আটা ২/১ ফোটা কলা বা অন্য দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

তাল—পাকা তাল পিত্ত রক্ত, ও কফ বর্ধক, দুস্পাচ্য বহুমূত্রজনক, তন্দ্রাকারক, বাত প্রশমক, পিত্ত নাশক এবং সারক।

কাঁচা বেল—ধারক, অগ্নি বর্ধক, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফ নাশক। কিন্তু পাকা বেলে ত্রিদোষ জন্মে।

আম—পাকা—বলকারক, গুরুপাক, বায়ু নাশক, সারক, তৃপ্তি জনক, পুষ্টিকারক এবং কফ বর্ধক। পাকাআম দুধের সহিত খাইলে, শুক্র বর্ধক, শরীরের বর্ণ সুন্দর কারক, বায়ু পিত্ত দূর করে, রুচিকারক হয়, পুষ্টিকারক এবং বল বর্ধক। অধিক টক আম ভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য, বিষম জ্বর; রক্ত দুষ্টি ও চক্ষুরোগ হইতে পারে। কিন্তু মিঠা আমে চক্ষুর হিত হইয়া থাকে ও কোন রোগ হয় না। পাকা আম সামান্য পিত্তকারক। কিন্তু কাঁচা আম পিত্তকারক নহে।

আমসত্ত্ব—ইহা তৃষণ, বমি, বায়ু ও পিত্ত দোষ দূর করে, সারক এবং রুচিকর। সূর্য তাপের আমসত্ত্ব সহজে হজম হয়।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল ঠাণ্ডা, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মাংস বর্ধক, অত্যন্ত কফ বর্ধক, বলকারক, শুক্র বর্ধক এবং পিত্ত, বায়ু রক্ত পিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ নাশক। কাঁঠালের বীজ শুক্র বর্ধক, মলরোধক ও মূত্র নিঃসারক, গুরুপাক। কাঁঠালের মজ্জা শুক্র বর্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক। গুল্ম রোগাক্রান্ত এবং মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির কাঁঠাল খাওয়া অনুচিত।

পেয়ারা—বলকারক, রুচিকর, শুক্রজনক, ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষণ, জ্বর, দাহ, মূর্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষ নিবারক।

কমলা লেবু—হজমশক্তি বর্ধক, বায়ু নাশক।

গাব—(পাকা ও কাঁচা) কাঁচা গাব বায়ু বর্ধক, ধারক, লঘু, ঠাণ্ডা। পাকা গাব পিত্ত, প্রমেহ, রক্ত দোষ ও দাহ নাশক।

ডাব নারিকেল—পিত্ত জ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগনাশক, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, পিপাসা নাশক, পেট শোধক।

বড় জাম—ইহা পাচক, মল বর্ধক, রুচিকর, কণ্ঠস্বর বর্ধক। পিত্ত, দাহ, ক্রিমি, শ্বাস ও শোষ রোগ, অতিসার, কাশ, রক্ত দোষ, কফ রোগ ও ব্রণ নষ্ট করে।

ছোট জাম—কফ, পিত্ত, রক্ত দুষ্টি ও দাহ নাশক।

কুল বা বড়ই—বড় মিঠা বড়ই। ইহা গুরুপাক, শুক্র বর্ধক ও পুষ্টিকর। ইহা পিত্ত, দাহ, রক্ত দোষ, ক্ষয় ও পিপাসা নাশক। শুকনা বড়ই ভেদক, অগ্নি বর্ধক ও সহজে হজম হয়। ইহা পিপাসা, ক্লান্তি ও রক্ত দোষ নাশ করে।

চালতা—কাঁচা চালতা কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা চালতা—ধারক, ত্রিদোষ নাশক, ও বিষ নাশক, শ্রান্তি ও শূল নাশক।

ক্ষীরুই—ইহা শুক্র বর্ধক, বলকারক, ঠাণ্ডা, গুরুপাক। ইহা পিপাসা, মূর্ছা মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্ত দোষ দূর করে।

তরমুজ—পাকা তরমুজ পিত্ত বর্ধক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

কামরাজা—ধারক, কফ ও বায়ু নাশক।

তেঁতুল—পাকা তেঁতুল অগ্নি বর্ধক, সারক, কফ ও বায়ু নাশক। কিন্তু কাঁচা তেঁতুল ভয়ানক ক্ষতিকর।

লেবু—জামীর লেবু বায়ু, কফ, বিবাজ, শূল, কাশ, বমির বেগ, বমি, পিপাসা, আম দোষ, হৃৎপিণ্ডা, মন্দাগ্নি ও ক্রিমি নাশক।

কাগজী ও পাতি লেবু—বায়ু নাশক, অগ্নি বর্ধক, পাচক ও লঘু। ক্রিমি নাশক, উদর রোগ নাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূল রোগে হিতকর। যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে, তাহার

পক্ষে উক্ত লেবু হিতজনক। ইহা ত্রিদোষ নাশক, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, রক্ত দুষ্টি, গলরোগ ও বিশৃচিকা রোগে প্রযোজ্য।

মনাক্লা-কিসমিস—ইহা পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাত রক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ, রক্ত পিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয় রোগ নাশক। ইহা ঠাণ্ডা, চক্ষুর জন্য হিতকর, শরীর বর্ধক, আওয়াজ পরিষ্কারক, মল-মূত্র নিঃসারক, পেটে বায়ুজনক, শুক্র বর্ধক।

খেজুর—ইহা ঠাণ্ডা, রুচিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, মলবর্ধক, বলকারক, ক্ষত নাশক ও ক্ষয় নিবারক, রক্তপিত্ত নাশক।

খেজুরের রস—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাত দূর করে। কফ নাশক, রুচিজনক, অগ্নি বর্ধক বলকর এবং শুক্রবর্ধক।

তালের রস—ইহা অত্যন্ত মত্ততাজনক, টক হইলে পর পিত্ত বর্ধক হয় ও বাত নাশক হইয়া থাকে।

দাড়িম্ব বা আনার—ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর হৃদরোগ, কণ্ঠগত রোগ ও মুখ রোগ নাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্র বর্ধক, লঘু, ঠাণ্ডা মেধা ও বল বর্ধক।

নাশপাতি—অমৃত ফল, লঘু, শুক্র বর্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষ নাশক।

কাবুলী বাদাম—সুস্নিগ্ধ, বায়ু নাশক, শুক্র বর্ধক, ইহা রক্ত পিত্ত রোগীর পক্ষে অহিতকর।

মধু—লঘু, ধারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নি বর্ধক, স্বর বর্ধক, ব্রণশোধক, শরীরে কোমলতা আনয়ন করে। মেধা শক্তি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, রুচিকারক, সামান্য বায়ু বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, কাশ, রক্ত পিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লাস্তি, ক্রিমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় রোগ নাশক।

মসল্লাদির গুণাগুণ

গোল মরিচ—অগ্নি বর্ধক, কফ ও বায়ু নাশক, ইহা শ্বাস, শূল ও ক্রিমি বিনাশক।

আদা—ইহা ভেদক, অগ্নি-দীপক, বাত ও কফ নাশক, খাওয়ার পূর্বে আদা ও লবণ বিশেষ হিতকর। ইহাতে অগ্নি দীপক, আহারে অরুচি জিহ্বা ও কণ্ঠ শোষিত হয়। প্রয়োগ নিষেধঃ কুষ্ঠ, পাণ্ডু রোগ, মূত্রকৃচ্ছ, রক্ত পিত্ত, জ্বর যুক্ত ব্রণ ও দাহ রোগে এবং গ্রীষ্ম শরৎকালে আদা হিতকর নহে।

ধনে—ইহা স্নিগ্ধ, মূত্রজনক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিকর, ধারক, ত্রিদোষ নাশক। ইহা তৃষণ, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ ও ক্রিমি নিবারক। ধনে শাক পিত্ত নাশক এবং উপরে লিখিত ধনের গুণ বিশিষ্ট।

হরিদ্রা বা হলদী—ইহা কফ দোষ, বাত দোষ, রক্ত দোষ, কুণ্ডু, প্রমেহ, ত্বক দোষ, ব্রণ, শোষ, পাণ্ডু রোগ, ক্রিমি, বিষ দোষ, অরুচি ও পিত্ত রোগের দোষ দূর করে।

লবঙ্গ—লঘু, চক্ষুর জন্য হিতকর, অগ্নিবর্ধক, পাচক ও রুচিকারক। ইহা কফ, পিত্ত, রক্ত দোষ, তৃষণ, বমি, শূল, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগ আশু বিনাশক।

বড় এলাচি—অগ্নি বর্ধক, লঘু। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষণ, বিষ দোষ, বস্তিগত রোগ, মুখের রোগ, বমি ও কাশ নষ্ট করে।

ছোট এলাচী—কফ, কাশ, শ্বাস, অর্শ রোগ, মূত্রকৃচ্ছ ও বায়ুনাশক, লঘু ও ঠাণ্ডা।

দারুচিনি—ইহা বাতের দোষ দূর করে, পিত্ত দোষ সারায়, সুগন্ধি, শুক্র বর্ধক বলকারক, মুখ শোষ ও তৃষ্ণা নিবারক।

তেজ পাতা—ইহা কফ, বায়ু, অর্শ, অরুচি বিনাশক।

মেথি—অগ্নি বর্ধক, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ বাড়ায়, বায়ু শ্লেষ্মা ও জ্বর নিবারক।

মৌরী বা মিঠা জিরা—ইহা যোনি শূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শূল, কাশ, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক।

সাদা জিরা—নরম পেট শক্ত করে, হজম শক্তি বাড়ায়, চক্ষুর হিতকারক, বীর্য বর্ধক, গর্ভ থলির সংশোধক, সুগন্ধিকর। ইহা বমি, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, কুষ্ঠ, বিষ রোগ, জ্বর, অরুচি, রক্ত দোষ, অতিসার ক্রিমি রোগ, পিত্তের দোষ, গুল্ম রোগ নাশক।

কালি জিরা—ইহা চক্ষুর হিতকর, পেট শক্ত করে, অগ্নি বাড়ায়, কফ নষ্ট করে, জীর্ণ জ্বর, শোথ, শির রোগ ও কুষ্ঠ রোগ ভাল করে।

বড় কালি জিরা—অজীর্ণ, বাত গুল্ম, রক্ত পিত্ত, ক্রিমি, কফ, পিত্ত আম দোষ ও শূল, রোগ নাশক।

পেঁয়াজ—বায়ু নাশক, বেশী পিত্তজনক নহে। বলকারক, বীর্য বর্ধক ও গুরুপাক, কফ বর্ধক।

রসুন—পুষ্টিকর শুক্র বর্ধক, স্নিগ্ধ, পাচক, সারক, ভগ্নস্থান জোড়া দায়ক, কঠ শোধক, বলকারক, ব্রণ প্রসাধক, মেধাশক্তি বর্ধক, চক্ষুর হিতকারক, পিত্ত রক্ত বর্ধক। ইহা হৃদরোগ, জীর্ণ জ্বর, বুক বেদনা, মল বর্ধতা, গুল্ম, অরুচি, কাশ, শোষ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক।

পান—ইহা রুচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কামভাব বর্ধক, ঘা বর্ধক, কফ নাশক, রাতকানা নাশক, বায়ু নিবারক, মুখ দুর্গন্ধ নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রুচি বর্ধক, অগ্নিদীপক, পাচক ও কফ বাত নাশক।

সুপারী—কফ দূর করে, পিত্তের দোষ নষ্ট করে, মদকারক, অগ্নি বর্ধক, রুচিকারক, মুখের নিরসতা নাশক। কাঁচা সুপারী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে, পেটের অগ্নি নষ্ট করে, ত্রিদোষ নাশ করে।

সাদা জর্দা বা (তামাক পাতা) কোন গুণ পাওয়া যায় নাই।

চুনা—(যে চুন পানের সহিত খাওয়া হয়) মনে রাখিতে হইবে যে, পাথর চুনা শরীরের ক্যালসিয়াম অর্থাৎ, শক্তিক্ষয় করে, জীবনী শক্তি নষ্ট করে, পাকস্থলীর শক্তি নাশ করে, এইজন্য কোন মতেই পাথর চুনা খাওয়া উচিত নহে।

বিনুক চুনা ও শামুক চুন—শরীরের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে।

বিনুক চুনের গুণ—এই চুন বাত, শ্লেষ্মা, মেদো রোগ, অল্প পিত্ত শূল, গ্রহণী, ব্রণ ও ক্রিমি রোগ নষ্ট করে। ৮ তোলা চুন দশ সের পানির মধ্যে দুই প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে, সেই পানির সহিত দুধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মধু মেহ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা অল্প পিত্ত ও শূল রোগের পথ্য ও ঔষধ। বিনুক চুনের মধ্যে মুক্তার গুণ পাওয়া যায়।

খয়ের—দাঁতের হিতকর। ইহা কুণ্ড, কাশ, অরুচি, মেদো দোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আম দোষ, পিত্ত, রক্ত দোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফ রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্রদর নাশক।

হিসাব-পত্র লিখার নিয়ম

আমাদের দেশের বহু লোক আছেন যঁাহারা হিসাব-নিকাশ, টাকা-পয়সার জমা-খরচ লিখা শিখেন নাই। তাঁহাদের সুবিধার্থে নমুনা-স্বরূপ কিছু হিসাব করার নিয়ম লিখিয়া দেওয়া হইল।

তাহা ছাড়া স্ত্রীলোকদের জন্যও হিসাব রাখার অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যিক। কেননা, অনেক সময় তাহারা স্বামীর দেওয়া টাকা-পয়সা রাখিতে না জানার দরুন কত টাকা কি বাবদ ব্যয় হইল তাহা নিয়া পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। স্বামীর ধমক খাইতে হয়। চাকর-নকর দ্বারা বাজার করাইতে হয়। হিসাব রাখিতে না পারার কারণে চাকরেরা পয়সার গাঁজামিল দেয়, চুরি করে।

পূর্বের জমা কত ছিল, বর্তমানে কত পাওয়া গেল, কি বাবদ কত খরচ হইল তাহা জানা না থাকার দরুন অনুমানে হিসাব দিতে হয় এবং অবিশ্বাসী হইতে হয়। উগ্রপন্থী স্বামী অনেক সময় এইসব কারণে অমানুষিক ব্যবহারও করিয়া বসে। সে জন্য মেয়েদের অবশ্যই হিসাব শিক্ষা করা কর্তব্য।

পূর্বে ষোল আনায় বা চৌষাট্টি পয়সায় এক টাকা গণনা করা হইত। এক আনা ১০ এইরূপ এবং দুই আনা ১০ এইরূপ লিখা হইত। বর্তমানে আর আনার প্রচলন নাই। এখন একশত পয়সায় এক টাকা গণনা করা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্বের মত টাকা-পয়সার মুদ্রার অংক লিখিবার জটিলতা আর রহিল না। এখন টাকার অংকের ডান পার্শ্বে “.” দশমিক বিন্দু দিয়া পয়সার অংক লিখিবে। যথা, ১.০৪৪ এক টাকা চৌয়াল্লিশ পয়সা, ১৭০.৯৪ একশত সত্তর টাকা চৌরানব্বই পয়সা, ১১.০৬ এগার টাকা ছয় পয়সা ইত্যাদি।

হিসাবের নমুনা

প্রথমে তারিখ ও বার লিখ। তারপর নীচের লাইন জমা শব্দটা লিখিয়া লম্বা একটা টান ডান দিকে খিচ। তারপর ডান পার্শ্বে খরচ শব্দটা লিখিয়া ডান দিকে লম্বা টান দাও। তাপর প্রত্যেক খরচের নীচে খরচ লিখ এবং যোগ করিয়া জমা হইতে বিয়োগ দিয়া হাতের নগদ টাকা হিসাব রাখ। খরচ বেশী হইলে অর্থাৎ কর্জ হইলে জমার ঘরে “কর্জ বাবদ জমা” শব্দটি লিখিয়া জমা করিয়া নেও এবং কর্জ পরিশোধের সময় খরচের ঘরে দেনা পরিশোধ শব্দ লিখিয়া হিসাব রাখ। প্রত্যেক প্রকারের জমা-খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

বিঃ তাং ৯ই মাঘ রোজ শনিবার—১৩৬৮ সন

হাল জমা—		খরচ—	
মনি আর্ডারে প্রাপ্ত—	৩৫.৪০	কাপড় খরিদ—	২১.৪৪
		মাছ বাবদ—	১.৬৮
বকেয়া জমা ধান বিক্রি বাবদ—	৬.৯৪	ডাইল বাবদ—	২.০০
		দুধওয়ালাকে—	৫.৪৮
মোট জমা—	৪২.৩৪	মোট খরচ—	৩০.৬০
মোট খরচ—	৩০.৬০		
মোট খরচ বাদে হাতে রহিল—	১১.৭৪		

বিঃ তাং ১১ই মাঘ সোমবার—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা—	১১·৭৪	মাছ তরকারী—	২·১৬
ধান বিক্রি বাবদ—	৯·১৪	লাকড়ী—	৩·০৯
মোট জমা—	<u>২০·৮৮</u>	ধোপার মজুরী—	·৬০
মোট খরচ—	৬·১০	পান সাদা—	·২৫
খরচ বাদে জমা—	১৪·৭৮	মোট খরচ—	<u>৬·১০</u>

বিঃ তাং ১৪ই মাঘ বৃহস্পতিবার—১৩৬৮ সন
জমা হইতে খরচ বেশী হওয়ায় কর্জ করা লাগিল

		খরচ—	
সাবেক জমা—	১৪·৭৮	খাজনা—	২০·১৯
কর্জ বাবদ—	২০·১৫	ডাক্তারকে—	৪·১৪
	<u>৩৪·৯৩</u>	নৌকা ভাড়া—	২·০০
		ছেলের পুস্তক—	১৮·০৯
৯·৪৯ পয়সা দোকানে বাকী			<u>৪৪·৪২</u>

বিঃ তাং ১৬ই মাঘ শনিবার—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা নাই		দোকানের দেনা শোধ—	৯·৪৯
গাছ বিক্রি বাবদ—	৪০·০০	চাউল দুই মণ—	৬৫·০৭
গরুর পাওনা ওয়াশীল—	৪৭·১৪	কুলির মজুরী—	২·১১
	<u>৮৭·১৪</u>	নাছিমার মাতাকে—	৭·২৫
	৮৩·৯২		<u>৮৩·৯২</u>
খরচ বাদে জমা—	৩·২২		

বিঃ তাং ৩০শে মাঘ, শুক্রবার—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা—	৩·২২	মাছ তরকারী—	২·১৪
নাছিমার মাতা—	৭·২৫	নিমক—	১·০৬
মোট জমা—	<u>১০·৪৭</u>	পেঁয়াজ—	·২৫
		সাবান—	২·১৭
		দুধের মূল্য—	৩·১৩
মোট জমা—	১০·৪৭	মোট খরচ—	<u>৮·৭৫</u>
মোট খরচ—	৮·৭৫		
খরচ বাদে জমা—	১·৭২		

হাতে রহিল এক টাকা বাহান্তর পয়সা

জমা খরচ সমান সমান

বিঃ তাং ১লা ফাল্গুন, শনিবার—১৩৬৮ সন

			খরচ—
সাবেক জমা—	২৮·৫৪	নৌকা ভাড়া—	৬·১২
হাল জমা নাই		চাউল—	২২·৪২
হাতে কিছুই নাই		মোট খরচ—	২৮·৫৪

৬৪ পয়সায় বা ষোল আনায় টাকা ধরিয়া পুরাতন নিয়মে হিসাব করার জন্য অল্প কথায় সহজ নিয়ম দেওয়া গেল। ইহাকে আর্য্যা বলে।

১ম নিয়মঃ—এক মণের দাম যত টাকা হইবে $\frac{1}{2}$ । আড়াই সেরের মূল্য তত আনা হইবে। যথা—একমণ চাউল ২৮ হইলে আড়াই সেরের দাম ২৮ আনা বা ১৫০ আনা হইবে।

২য় নিয়মঃ—এক টাকায় যত সের জিনিস পাওয়া যাইবে ৪০ টাকায় তত মণ জিনিস পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় $\frac{1}{11}$ দেড় সের চাউল পাওয়া গেল ৪০ টাকায় দেড় মণ পাওয়া যাইবে।

৩য় নিয়মঃ—এক টাকায় যত সের বস্ত্র পাওয়া পাইবে, এক আনায় তত ছটাক বস্ত্র পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় তিন সের দুধ পাওয়া গেলে এক আনায় তিন ছটাক দুধ পাওয়া যাইবে।

৪র্থ নিয়মঃ—এক টাকায় যে বস্ত্র পাঁচ সের পাওয়া যায় ৮ (আট) টাকায় সে বস্ত্র এক মণ পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় পাঁচ সের গোল আলু পাওয়া গেলে আট টাকায় এক মণ আলু পাওয়া যাইবে।

৫ম নিয়মঃ—১ টাকায় যত গজ কাপড় পাওয়া যাইবে, ১ আনায় তত গিরা পাওয়া যাইবে। যে সকল গৃহ-কন্যারা স্কুলে বা মন্ত্রেবে লেখাপড়া করেন নাই এবং অঙ্ক জানেন না, তাহাদের সহজভাবে হিসাব শিক্ষার জন্য উপরোক্ত হিসাবটুকু লিখিয়া দেওয়া হইল।

পোষ্ট এবং টেলিগ্রাম অফিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

পত্রাদির নিয়ম—একখানা পোষ্ট কার্ডের দাম নয় পাঁচ পয়সা। উহার যে পৃষ্ঠে ঠিকানা লেখার দাগ কাটা আছে, তাহার বাম পার্শ্বে নিজ বক্তব্য লিখা যায়; কিন্তু ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিতে হইবে। কোন কোন লোক ঠিকানার স্থলে দুই একটা শব্দ লিখিয়া দেয়। ইহা বড়ই অন্যায। ইহাতে পত্র বেয়ারিং হইয়া যায়। অর্থাৎ, যাহার নিকট পত্র যাইবে, তাহার নিকট হইতে ডাক বিভাগ নয় দশ পয়সা উশুল করিবে। সুতরাং বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা এবং বক্তব্য লিখিবে আর ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিবে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া পূর্ণরূপে লিখিবে। সে স্থান যদি বিখ্যাত না হয়, তবে পোষ্টের সহিত জেলার নামও লিখে দাও। আর যদি বড় শহরে পত্র পাঠাইতে হয়, তবে মহল্লা ও বস্তির নাম, বাড়ীর নম্বরও লিখিয়া দাও।

৩। যদি লেফাফায় পত্র দিতে চাও, তবে উহার উপর ঠিকানার স্থানে কিছু লিখিলে বে-আইনী হইবে।

৪। যদি পোষ্ট কার্ডের সমতুল্য লম্বা এবং চৌড়া গ্লোজ মোটা কাগজে পত্র লিখিয়া ঠিকানার স্থানে ঠিকানা লিখিয়া টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে ইহাও পোষ্ট কার্ড বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে উহা আর প্রাপকের নিকট যাইবে না। ডাক বিভাগের লোকেরা উহা নিয়া লা-ওয়ারিশ পত্রে শামিল করিয়া ফেলিবে। হাঁ, যদি পোষ্ট কার্ডের সাইজ হইতে কিছু কম চওড়া থাকে এবং অপর পৃষ্ঠের ডান অর্ধে ঠিকানা দেওয়া থাকে, তবে উক্ত পত্র বেয়ারিং হইয়া মালিকের নিকট পৌঁছবে; ইহাকে প্রাইভেট কার্ড বলা হয়। এইরূপ কার্ডের ডান দিকে মোহরাদির জন্য স্থান রাখিতে হইবে এবং ডান পার্শ্বে কিছু লিখিবে না। আর যদি বাম অর্ধেকে ঠিকানা লিখ, তবে উহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

যদি সাদা লেফাফায় ১৫ পয়সার টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে উহাও পনের পয়সার ইনভেলাপ হইয়া যাইবে। যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে ৩০ পয়সার বেয়ারিং হইয়া যাইবে। কিন্তু লেফাফা আটকাইয়া দিতে হইবে। আঠা দিয়া আটকাইয়া না দিলে টিকেটবিহীন ইনভেলাপ লা-ওয়ারিশ চিঠি বলিয়া গণ্য হইবে। পথে যদি টিকেট লাগাইতে না পাও, তবে অন্য পোষ্ট কার্ডের স্টাম্পের চাপ দেওয়া স্থান হইতে কাটিয়া নিয়া অন্য পত্রে লাগাইও না। যদি লাগাও, তবে তাহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

৫। কার্ড বা লেফাফা এরূপভাবে ধুইও না—যাহাতে টিকেটের রং বিগড়াইয়া যায়। এরূপ ময়লা টিকেট পত্রে লাগাইও না যাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। টিকেটের উপর নিজ নাম লিখিও না। কোন প্রকার দাগও কাটিও না; বরং টিকেট পরিষ্কার রাখ, অন্যথায় পত্র বেয়ারিং হইয়া যাইবে। ব্যবহার্য টিকেটও পত্রে কখনও ব্যবহার করিও না; ইহাতেও পত্র বেয়ারিং হয়। যদি পূর্বের ব্যবহার্য টিকেটের দাগ ধুইয়া মুছিয়া ব্যবহার করিতে চেষ্টা কর, তবে তাহা কঠিন অপরাধ হইয়া যাইবে এবং এইরূপ টিকেট ব্যবহারকারীকে মোকদ্দমায় সোপর্দ করা হয়। অনেক স্থলে কঠিন সাজাও হইয়া থাকে।

৬। কেহ কেহ জওয়াবী কার্ড না পাইলে উত্তরের জন্য দুইখানা কার্ড সেলাই করিয়া জোড়াইয়া দেয়। ইহাতেও চিঠি বেয়ারিং হইয়া যায়। সুতরাং জওয়াবী কার্ড সংগ্রহ করিয়াই পত্র দেওয়া উচিত। জরুরী পত্রাদি তাড়াতাড়ি বিলি করার জন্য প্রেরককে এক্সপ্রেস ডেলিভারীর জন্য অতিরিক্ত ০.১৫ পয়সার টিকেট লাগাইতে হয়। লেফাফায় পত্র ভরিয়া নিক্তি দ্বারা এক তোলার ওজন লইয়া পত্রটি ওজন দাও। এক টাকায় এক তোলা হয়, যদি এক তোলার বেশী ওজন না হয়, তবে ০.১৫ পয়সায় যাইবে। এক তোলার বেশী হইলেই প্রতি তোলায় ০.৫ পয়সার টিকেট বেশী লাগে। আর যদি অতিরিক্ত চার্জের টিকেট না দিয়া পত্র ছাড়, তবে প্রাপকের নিকট হইতে ডবল চার্জ উসূল করা হইবে। অর্থাৎ, এখানে যে টিকেট লাগিত উহার দ্বিগুণ।

যদি প্রাপক বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তবে সেই পত্র তোমার অর্থাৎ, প্রেরকের নিকট ফিরিয়া আসিবে এবং তোমাকেই উহার দ্বিগুণ মাশুল দিতে হইবে। আর যদি তুমি এই মাশুল দিতে অনিচ্ছুক হও, তবে ভবিষ্যতে তোমার নামের পত্র আটক রাখা হইবে, যাবৎ তুমি উক্ত ঋণ পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তোমার চিঠি বিলি করা হইবে না।

৭। এক লেফাফায় কয়েকজনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পত্র লিখিও না। কেননা, ডাক বিভাগের নিষেধ আছে। তা ছাড়া শরীঅতেও এরূপ করা দুরূহ নহে। হাঁ, তুমি যাদের সম্বন্ধে জানিতে চাও তাদের বিষয় ঐ একই পত্রে দু'চার কথা লিখিতে পার, তাতে দোষ নাই। কিন্তু অনর্থক এক লেফাফায় কতকগুলি চিঠি বানাইয়া সাজাইয়া লিখিয়া দিও না।

৮। চিঠি বা পার্শেলের উপর যত মূল্যের টিকেট লাগান প্রয়োজন, তাহা হইতে কম লাগাইলে যত কম টিকেট লাগান হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ প্রাপকের নিকট হইতে উসূল করা হইবে।

বুক-পোস্টের নিয়ম

১। যে সমস্ত কাগজ ছাপান, যেমন, কিতাব, খবরের কোগজ বা মাসিক পত্র-পত্রিকা। যদি ইহা ডাকে পাঠাইতে হয়, তবে এমনভাবে উহা প্যাকেট করিবে যেন ডাক ঘরের লোকের খুলিতে অসুবিধা না হয়। এই প্রকারের পার্শেলকে বুক পোস্ট পার্শেল বলে। প্রথমে উহার পাঁচ তোলা পর্যন্ত ৭ (সাত) পয়সা, উহার অতিরিক্ত প্রতি ২।।০ তোলা বা উহার অংশের জন্য ৩ পয়সার টিকেট বাড়াইতে হইবে।

২। বুক পোস্ট পার্শেলের মধ্যে চিঠি দেওয়া নিষেধ।

৩। বুক পোস্ট পার্শেলের মধ্যে কোন টাকার নোট, ছুঁড়ি স্ট্যাম্প বা ব্যাঙ্কের নোট ইত্যাদি কাগজপত্র যাহার পরিবর্তে টাকার মূল্য পাওয়া যায়, তাহা পাঠান নিষেধ। পার্শেলের প্যাকেট দুই ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া এবং এক ফুট উঁচু হইবে, ইহার অতিরিক্ত হইতে পারিবে না। আর যদি গোলাকার করিয়া বটিয়া দেওয়া হয়, তবে ৩০ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪ ইঞ্চি মুখে, ইহার অতিরিক্ত প্যাকেট করা যাইবে না।

৪। প্যাকেট পাঠানোর সময় যদি টিকেট এখান হইতে না লাগাইয়া দাও, তবে বেয়ারিং হইয়া যাইবে ও প্রাপকের নিকট দ্বিগুণ মাশুল উসূল করা হইবে। সে যদি পার্শেল না রাখে, তবে প্রেরকের নিকট হইতেই সেই দ্বিগুণ মাশুল উসূল করা হইবে।

রেজিষ্টারীর নিয়ম—চিঠি-পত্র, প্যাকেট বা পার্শেলের যদি বেশী হেফায়ত করিতে চাও, তবে উহা বেজিষ্টারী করিয়া লও। অর্থাৎ, পত্রের উপর অতিরিক্ত আরও ৪০ পয়সার টিকেট লাগাও এবং নিজে অফিসে যাইতে না পারিলে পিয়নকে বলে দাও যে, ইহাকে রেজিষ্টারী করিয়া দিতে হইবে। অফিস হইতে রেজিষ্টারী করার একটি রসিদ পাওয়া যাইবে। উহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিও।

যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, যাহার নিকট যাহা পাঠাইবে, তাহার দস্তখত করা প্রাপ্তি স্বীকার রসিদও পাওয়া দরকার, যেন সে পত্র পাওয়া অস্বীকার করিতে না পারে যে, আমার নিকট পত্র বা পার্শেল পৌঁছে নাই, তবে তুমি আরও ১৩ পয়সার টিকেট দিয়া একনোল্যাজম্যান্ট রসিদ দিয়া দাও। অথবা পোস্ট মাস্টারকে বল, প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ বা একনোল্যাজম্যান্ট রসিদ দিয়া দেন। উহা একখণ্ড ছোট ছাপান কাগজ। উহার এক পার্শে প্রেরকের ঠিকানা এবং অপর পার্শে প্রাপকের ঠিকানা লিখার ঘর থাকে। তাহা পূরা করিয়া পত্রের সহিত বাঁধিয়া দিলেই প্রাপকের নিকট তোমার প্রেরিত পত্র বিলি করার সময় প্রাপকের দস্তখত হইয়া উক্ত রসিদ ফেরত ডাকে তোমার নিকট আসিবে। ইনসিওর বা ছুঁড়ি, টিকেট, স্ট্যাম্প, ইত্যাদির হেফায়তের জন্য রেজিষ্টারী করা প্রয়োজন। কেননা, রেজিষ্টারী না হইলে যদি উহার কোন প্রকার ক্ষতি হয়, তবে ডাক বিভাগ সে জন্য দায়ী হইবে না।

রেজিষ্টারী পত্রের নীচের দিকে বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা নাম ধাম লিখে দাও। কেননা, যাহার নিকট পাঠাইতেছ তাহাকে যদি না পাওয়া যায়, তবে যেন অবিলম্বে তোমার নিকট ফেরত আসিতে পারে।

বীমা বা ইনসিওরের নিয়ম

যদি কোন মূল্যবান বস্তু যাহা সোনা রূপার অলঙ্কার বা টাকার নোট ইত্যাদি কোথায়ও নিরাপদে পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিয়া দাও।

বীমার এনভেলোপ বা প্যাকেটের সেলাই করার স্থানটা প্রত্যেক ইঞ্চির পর পর গালা দিয়া কোন নাম খোদাই করা সীল দ্বারা মোহর করিয়া দাও। বুতাম, পয়সা বা টাকা কিংবা ফুল ইত্যাদির ছাপ দিও না। বীমার উপর প্রাপকের এবং প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কার লিখিয়া দাও। বীমার মূল্যও লিখিতে হইবে। যেমন ৩০০ তিন শত টাকা বা ৫০০ পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি। মূল্যটা কথায়ও লিখিয়া দিতে হইবে। আর যদি টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে টাকার সংখ্যাও কথায় ও অঙ্কে লিখিয়া দিতে হইবে।

যদি তিনশত বা উহার কম টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে লেফাফার মূল্য এবং রেজিষ্টারীর খরচের অতিরিক্ত ৫০ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে। তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত ইনসিওর করা যায় না। যদি লেফাফার মধ্যে নোট ভর্তি করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিতেই হইবে।

ইনসিওর বা বীমার জন্য পোষ্ট অফিস হইতে রেজিষ্টারী লেফাফা সবচেয়ে নিরাপদ। কেননা, উহার ভিতর দিকে কাপড় লাগান থাকে এবং খুব মজবুত হওয়ার কারণে নোটগুলি ভাল থাকে। উহার উপর রেজিষ্টারী খরচ দিতে হয় না, লেফাফার মূল্যের সহিতই রেজিষ্টারী চার্জ নিয়া নেওয়া হয়। উহার ওজন যদি এক তোলা অতিরিক্ত না হয় বা এক তোলা কম হয়, তবে উহা রেজিষ্টারীর সময় অতিরিক্ত পয়সা দিতে হইবে না। যদি এক তোলা বেশী হয়, তবে চিঠির নিয়ম মত তোলা বা তোলা অংশের জন্য পাঁচ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে।

টাকা, সোনা, চাঁদি ও মূল্যবান পাথরাদি, নোট বা উহার অংশ, অথবা সোনা চাঁদির তৈরী কোন বস্তু অবশ্যই বীমা করিতেই হইবে। বীমা ছাড়া পাঠাইলে ডাক ঘরের লোকেরা জানিতে পারিলে উহা প্রেরককে ফেরত দিবে এবং এক টাকা জরিমানা আদায় করিবে অথবা যদি প্রাপক অস্বীকার করে যে, উহা তাহার রাখার ইচ্ছা নাই, তবে বীমাহীন পার্শেলটি প্রেরককে দেওয়া হইবে এবং এক টাকা জরিমানা উসুল করা হইবে।

পার্শেলের নিয়ম—১। টাকা, পয়সা, অলঙ্কার, ঔষধ, আতর অথবা কাপড় ইত্যাদি দ্রব্য কোন ডিব্বার মধ্যে বা কোন বাস্কে ভরিয়া উহার উপর কাপড় মোড়াইয়া সেলাই করিয়া গালা দিয়া আটকাইয়া ডাকে পাঠানের নামই হইতেছে পার্শেল। পার্শেলের মাশুল—প্রতি চল্লিশ তোলা জন্য ৫০ পয়সা এবং তদূর্ধ্ব আরও ৪০ তোলা বা উহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা।

২। সাড়ে বার সের বা ১০০০ তোলা পর্যন্ত পার্শেলে পাঠান যায়।

৩। পার্শেলের মধ্যে একটা পত্র দেওয়ার অনুমতি আছে, তাহা শুধু ঐ ব্যক্তির নামেই থাকিবে যাহার নামে পার্শেল যাইবে।

৪। পার্শ্বলের সেলাইগুলির উপর উত্তমরূপে গালা লাগাইয়া মোহর করিয়া দিও। উহাতে হেফায়ত হইবে।

৫। এত ছোট পার্শ্বল করিও না যাহার উপর ডাকঘরের মোহর করার স্থান হয় না।

৬। পার্শ্বল বেয়ারিং যায় না। উহার মধ্যে যদি মূল্যবান বস্তু থাকে, তবে উহা রেজেস্টারী করাইয়া দাও, তাহা হইলে নিরাপদে পৌঁছাবে।

ভি, পি-এর নিয়ম

১। কাহারো নিকট কোন বস্তু ডাকে পাঠাইয়া যদি উহার মূল্য উসূল করিয়া লইতে চাও, তবে পার্শ্বল প্যাকেট বা পত্রের উপর প্রাপকের ঠিকানা লিখিয়া উহার মূল্য যথাঃ—ভি, পি মূল্য—এগার টাকা, এইরূপ লিখিয়া উহার সহিত একখানা ভি,পি, মনিঅর্ডার ফরম পুরা করিয়া পাঠাইয়া দাও। ইহা রেজেস্টারী করান অবশ্য কর্তব্য। এই জন্য মাশুলের টিকেট যত মূল্যের হইবে, উহার অতিরিক্ত টিকেট লাগাইতে হইবে। পোষ্ট অফিস হইতে তুমি একটা রসিদ পাইবে উহা যত্নে রাখিও। প্রাপক হইতে তোমার প্রাপ্য টাকা উসূল হইয়া তোমার নিকট পৌঁছাবে।

২। এক হাজার টাকার অতিরিক্ত ভি, পি, হইতে পারে না।

৩। সরকারী ভি, পি, ছাড়া সাধারণ ভি, পি, আনার ভংগাংশে হয় না।

৪। যদি প্রাপক ভি,পি, রাখিতে অসম্মত হয়, তবে প্রেরকের নিকট উহা ফেরত দেওয়া হইবে। মূল্য তলব করা ভি,পি,রও বীমা করা যায়। ভি,পি'র টাকা যদি এক মাসের মধ্যে উসূল হইয়া না আসে, তবে সংশ্লিষ্ট পোষ্টাল কর্মচারীকে লিখিতে হইবে।

মনিঅর্ডারের নিয়ম

যদি তুমি ডাকযোগে অন্যত্র টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে ডাকঘর হইতে একটা মনিঅর্ডার ফরম লইয়া তাহা পূরণ করিয়া টাকা ও ফরম ডাকঘরে পাঠাইয়া দাও। সাথে সাথে টাকা পাঠাইবার মাশুলও পাঠাইয়া দাও। একখানা রসিদ পাইবে উহা সযত্নে রাখিও। প্রাপকের দস্তখত হইয়া উক্ত মনিঅর্ডারের এক অংশ তোমার নিকট আসিবে।

একসঙ্গে ৬০০ (ছয় শত) টাকা উর্ধ্ব মনিঅর্ডার করা যায় না।

মনিঅর্ডারের মাশুল প্রতি দশটাকা বা উহার অংশের জন্য ৩০ পয়সা। এরোপ্লেনে মনিঅর্ডার পাঠাইতে হইলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। একশত টাকার উর্ধ্ব মনিঅর্ডার করিলে উহার মাশুলের হিসাব প্রথম হইতে ধরিতে হইবে।

১। মনিঅর্ডার ফরমের নীচে কিছুসাদা স্থান থাকে সে স্থানে প্রেরকের বক্তব্য লিখার অধিকার আছে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে, অন্যথায় লিখার গোলমালে অন্যত্র টাকা বিলি হইলে ডাক বিভাগ দায়ী হইবে না।

৩। প্রাপক যদি টাকা না রাখে বা ঠিকানা ভুল হওয়ার কারণে টাকা বিলি না হয়, তবে উহা প্রেরকের নিকট ফেরত আসিবে।

৪। তোমার টাকা অতিসত্বর পৌঁছাইতে হইলে, টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার কর।

টেলিগ্রামের নিয়ম—টেলিগ্রাম দুই প্রকার, জরুরী ও সাধারণ। পাকিস্তানের যে কোন স্থানে টেলিগ্রাম পাঠান হউক না কেন উহার মাশুল ঠিকানাসহ প্রতি ৮ শব্দের জন্য ৮৭ পয়সা

ও অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য ৬ পয়সা। জরুরী টেলিগ্রামের ফিস, সাধারণ টেলিগ্রামের ফিসের দ্বিগুণ।

পাসপোর্ট ও ভিসা

এক রাষ্ট্রের কোন লোক অন্য রাষ্ট্রে গমন করার জন্য নিজ রাষ্ট্র সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয়, উহাকে পাসপোর্ট বলে। আর যেই ভিন্ন রাষ্ট্রে গমন বা অবস্থান করার প্রয়োজন হয়, সেই রাষ্ট্রের সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয় উহাকে ভিসা বলে। পাসপোর্ট অফিস হইতে ১৩ পয়সা মূল্য দিয়া ছাপান ফরম লইয়া উহা পূরণ করিয়া নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী তিন টাকা ফিস জমার রসিদসহ জেলা অফিসারের নিকট পাঠাইতে হয়। উহা মঞ্জুর হইলে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। পাসপোর্টের মেয়াদ আপাততঃ পাঁচ বৎসর। পাসপোর্ট পাওয়ার পর ভিসার জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। ভিসার জন্যও ছাপান ফরম পাওয়া যায়। নির্ধারিত নিয়মে এক টাকা ফিস দিয়া যে দেশে যাইতে ইচ্ছুক সেই দেশের হাইকমিশনার বরাবরে দরখাস্ত করিতে হয়। তিনিই ভিসা প্রদানের অধিকারী।